Reading Room Copy.

Occasional Paper No. 18

বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে যতিচিহ্নের ব্যবহার ১৮১৮—১৮৫৮

দেবেশ রায়

Use of punctuation marks in the Bengali journalistic prose 1818—1858

DEBES ROY

S/531
C-3.

CENTRE FOR STUDIES IN SOCIAL SCIENCES, CALCUTTA

Occasional Paper No. 18

বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের গদ্যে যতিচিহ্নের ব্যবহার
১৮১৮—১৮৫৮

দেবেশ রায়

April 1978

CENTRE FOR STUDIES IN SOCIAL SCIENCES, CALCUTTA
10 Lake Terrace, Calcutta-700029.

531
Centre for Studies in Social Sciences Calcutta
LIBRARY.
C-3

পুরনো বাংলা সংবাদসাময়িকপত্রের যে- সব সংকলন বেরিয়েছে আর যে- সব কপি কটিমাত্র লাইব্রেরিতে এখনো আছে — সেইগুলির ওপরই আমার একমাত্র নির্ভর। আমি কোনো প্রাচীন পত্রিকার নতুন সন্ধান দিই নি বা কোনো পুরনো পত্রিকার নতুন কপিও আবিষ্কার করি নি। প্রাপ্ত তথ্যের কিছুটা বিশ্লেষণ — এ-ছাড়া এই প্রবন্ধের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

বাংলা সাংবাদিক গদ্যের সমাজসম্পর্ক ও বাঙালি সমাজের গদ্যঅভ্যাস সম্পর্কে অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে বাংলায় যতিচিহ্নের ব্যবহার বিষয়ে কতকগুলি বিশিষ্টতার লক্ষণ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। গদ্যলেখন আর গদ্যকথনের মাঝখানে যতিচিহ্নই হচ্ছে সেই সেতু যা এদের ভেতরকার দূরত্ব কমিয়ে আনে, আবার রক্ষাও করে, যখন যেমন দরকার। একজন লেখকের কথা বলার ধরণ আর একটি সমাজের রিডিং পড়ার ধরণের মাঝখানে যতিচিহ্নই হচ্ছে সেই যন্ত্র, যা এদের পার্থক্য স্বীকৃতিকে একটিমাত্র স্কেলে বাঁধতে পারে, আবার আলাদাও করে দিতে পারে, যখন যেমন দরকার।

বাংলা গদ্যে এমনটি হতে পারে নি। কারণ, শুধু বাঙালি সমাজের বিকাশের নিজস্বতাতেই বাংলা গদ্য তৈরি হয়ে ওঠে নি – এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রবল উপস্থিতি ও প্রয়োজন বাংলাগদ্যের ঐতিহাসিক বিকাশকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে।

এই প্রবন্ধে কতকগুলি উদাহরণের পাঠগত আলোচনা ও বাক্যগঠনের ব্যাকরণগত বিশ্লেষণের পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করে যতিচিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কে কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করেছি। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে কলকাতার নতুন নাগরিক পৌর সমাজের প্রিন্ট-প্রতিপ্রিন্ট, ঐতিহ্য ও অভ্যাসের নির্দেশক হিসেবেই এই সিদ্ধান্তগুলি বিচার্য ও সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এই আপাত-ব্যাকরণিক সিদ্ধান্তগুলির সমাজতত্ত্ব নিহিত / বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের গদ্য-সংক্রান্ত একটি প্রকল্পের অংশ এই নিবন্ধ। বিষয়ের দিক থেকে সম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এমন হতে পারে যে এই নিবন্ধের কোনো কোনো মন্তব্য বা অনুমানের প্রতিষ্ঠা হয়তো প্রকল্পের অপর কোনো অংশের বিশদ ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরশীল।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সমাচার দর্পন'-এর যতগুলি সংখ্যা দেখতে পেয়েছিলেন, সেগুলি সব এখন আর পাওয়া যায় না। ১৮১৯ থেকে ১৮২৪ এর একটি ফাইল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ও ১৮৩১ থেকে ১৮৩৭ এর একটি ফাইল ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে আছে - প্রচুর ছাড়সহ। নিবন্ধে ব্যবহৃত উদাহরণগুলি মূলের সঙ্গে মিলিয়েছি — যথাসম্ভব। উদাহরণের শুরুতে তারিখসহ সংবাদ-সাময়িকপত্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, শেষে, স.সে.ক ১ বা ২ (শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দুই খন্ড) এবং সা. বা. স. ১, ২, ৩ বা ৪ (শ্রীবিনয় ঘোষ সম্পাদিত সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চারখন্ড) এই দুই আকরগ্রন্থের প্রাসঙ্গিক পৃষ্ঠার উল্লেখ আছে যদিও অনেকক্ষেত্রে এই দুটি

বই-এর পাঠ ও এই নিবন্ধের পাঠে কিছু কিছু তফাৎ আছে। এই দুটি বই-এ নেই এমন উদাহরণের বেলায় মূলেরই নির্দেশ আছে শুধু অপত্যা।

এই নিবন্ধ রচনায় অধ্যাপক অশোক সেন-এর কাছ থেকে পরামর্শ ও সাহায্য পেয়েছি। মতামত ও সিদ্ধান্তের দায় সর্বৈব আমার।

সমালোচক বন্ধু অরুণ সেন তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের কয়েকটি বই দিয়ে ও অধ্যাপিকা শান্তা সেন কয়েকটি বই জুগিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

দেবেশ রায়

শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । গত ১৭ আষাঢ়ীয় চন্দ্রিকায় কস্যচিৎ বিদেশি পাঠকের লিখিত এক পত্র পাঠে তুষ্ট হইলাম যেহেতুক তিনি লেখেন যে বাঙ্গালা লেখার সেমাদি নির্ণায়ক চিহ্নভাবে অনেক ব্যাঘাত হয় । এ কথা আমি স্বীকার করি কিন্তু চিহ্ন ভিন্ন পাঠে ভিন্ন দেশীয়দিগের যে প্রকার ব্যাঘাত এতদ্দেশীয়দিগের তাদৃশ নহে যেহেতুক বালক কালে অর্থাৎ পাঠদশায় যে সংস্কার জন্মে তাহার অন্যথা হয় না । . . . তিনি যে প্রকার চিহ্ন দিতে পরামর্শ দেন তাহা চলিত হইলে ভাল হয় কিন্তু ব্যবহার হওয়া সুকঠিন যেহেতুক অস্মদ্দেশীয় ভাষা ও অক্ষর আধুনিক নহে ইহার মূল সংস্কৃত তাহার লিখন পঠনের যে ধারা ও ছেদ ও ভেদের যে চিহ্ন এক দাঁড়ি আছে তাহাই তাবদ্দেশ অর্থাৎ সংস্কৃত শাস্ত্র ও তন্মূলক ভাষা ব্যবসায়িদিগের চলিত আছে এক্ষণে নূতন কোন বিষয় কি প্রকার চলিত হইতে পারে যদ্যপি ইংগ্লণ্ডীয় অক্ষরের সহিত ব্যবহৃত চিহ্ন বাঙ্গালা অক্ষরে ব্যবহার করা যায় তবে তত্তৎ চিহ্নানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐ চিহ্ন সকল কোন অক্ষর জ্ঞান করিয়া যথার্থে সন্দিগ্ধ হইতে পারেন যদ্যপি লেখক মহাশয় ইহার এক ব্যাকরণ সৃষ্টি করিতে পারেন ও তাহা পাঠশালায় ব্যবহার করান তবে কালে চলিত হইবেক . . . অলমতিবিস্তরেন ২৭ আষাঢ় । কস্যচিৎ হিন্দু পাঠকস্য । সমাচার চন্দ্রিকা [সমাচার দর্পণ, ১৮ জুলাই, ১৮২১ পুনর্মুদ্রিত, সংবাদপত্রে সেকালের কথা - ১ম খণ্ড, পৃ ৫২]

আলোচনার পূর্বসূত্র ও বর্তমান আলোচনার কালসীমা ও বিষয়

এক

বাংলা গদ্যে যতিচিহ্নের ব্যবহার নিয়ে এখন পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে তার প্রধান প্রবণতা কালানুক্রমিক ঐতিহাসিক। শ্রীসুকুমার সেন রচিত 'বাঙ্গলা সাহিত্যে গদ্য' বইটিতে এ-বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা অনেক আগেই করা হয়েছিল। ১৩৭০ বঙ্গাব্দের কার্তিক - পৌষ সংখ্যার 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'-য় শ্রীশিশিরকুমার দাশ কিছু নতুন তথ্যের ভিত্তিতে শ্রীসুকুমার সেন-এর কিছু তথ্যের ভুল দেখান। তার ঠিক পরের সংখ্যায় শ্রীসুকুমার সেন এ-বিষয়ে আলোচনা করেন। শ্রীপ্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য-এর "Rammohun Roy and Bengali Prose" নিবন্ধে প্রসঙ্গত যতিচিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কে নতুন তথ্যের ভিত্তিতে নতুন সিদ্ধান্ত আছে। কিন্তু তাঁর আলোচনার বিষয় আলাদা। এই সমস্ত আলোচনার মূল প্রবণতা বর্তমানে বাংলায় প্রচলিত যতিচিহ্নগুলি কে কবে কখন প্রথম ব্যবহার করেন। শ্রীশিশিরকুমার দাশ ও শ্রীপ্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য প্রসঙ্গত যতিচিহ্ন ব্যবহারের নান্দনিকতা সম্পর্কেও কিছু মন্তব্য করেছেন। এই আলোচনাগুলির সিদ্ধান্তগুলির সংক্ষিপ্তসার :-

শ্রীশিশিরকুমার দাশ :

১। " . . . ১৮০১ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত . . . বাংলাগদ্যে যতিস্থাপন নিয়ে বাঙালী লেখকরা চিন্তা করেছেন। যতিস্থাপন করায় বিদেশীরা এবং বাঙালী উভয় প্রচেষ্টাই অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এবং শেষ পর্যন্ত বাংলায় প্রাচীন বাংলা ও ইংরেজি যতির যুগল সম্মিলনে গড়ে ওঠে। যতিচিহ্ন - প্রবর্তন কোনো ব্যক্তির একক প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে নি।"

২। " . . . বাংলা যতিচিহ্ন সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। . . . দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যতিচিহ্ন ব্যবহার ভাষণকলার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত . . . । অপর পক্ষে তাঁর বাক্যগুলির শ্বাসপর্বগুলি অর্থপর্বের (Semantic group) একীভূত - . . . ।"

৩। 'উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ শতকে আরো বহু গ্রন্থ পাওয়া যায় -- যেখানে যতিচিহ্নের বহুল ব্যবহার হয়েছে এবং সার্থক ব্যবহার হয়েছে। . . . এই তিনটি বক্তব্য থেকে যে সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে ঐতিহাসিককে গ্রহণ করতে হয় তা হল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা যতিচিহ্ন প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।"

৪। " ... আমাদের দেশে পণ্ডিত-মহলে যে ধারণা আছে বিদ্যাসাগরই বাংলায় সর্বপ্রথম সার্থকভাবে যতিচিহ্নগুলি ব্যবহার করেন তা সত্য নয়। ১৮৫০ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর কোনো ইংরেজি যতিচিহ্ন গ্রহণই করেন নি।"

শ্রীসুকুমার সেন :

" কমা, কোলন, সেমিকোলন - আয় ফুলস্টপ পর্যন্ত বিদেশি ছেদচিহ্নগুলি এ দেশের ভাষার কোলায় প্রথমে রোমান হরফে ছাপায় গৃহীত হয়েছিল। তারপর ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে স্কুলবুক সোসাইটি তাঁদের অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকে তা চালু করলেন। কিছুদিন পরে ফুলস্টপের স্থানে দাঁড়ি এল। সেই থেকে, অর্থাৎ আনুমানিক ১৮২০-২২ থেকে, বাংলা হরফে কমা কোলন সেমিকোলন ও দাঁড়ি রীতিমত ছেদচিহ্নরূপে দেখা দেয়। কলকাতার মিশনারিরা অনেকদিন পর্যন্ত (আমার কাছে যে প্রমাণ আছে তাতে ১৮৫১ পর্যন্ত) ফুলস্টপ ছাড়েন নি। সাধারণ প্রেসে অন্তত ১৮৩৪ পর্যন্ত ফুলস্টপ বজায় ছিল। ১৮৪২ সালেও ফুলস্টপের দেখা দিল।

দাঁড়িকে Parenthesis চিহ্নরূপে ব্যবহার রামরাম বসুর বইয়ে প্রথম দেখেছি। . . . রামমোহন রায়ের কোনো কোনো পুস্তিকাতেও আছে। ব্র্যাকেট চিহ্নরূপে " (" ব্যবহার রামমোহনের পুস্তিকায় ও অন্যত্র আছে। জিজ্ঞাসাচিহ্ন চতুর্থ দশকের আগেকার কোন বইয়ে দেখি নি।"

প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য :

.....Rammohun's punctuation in Subrahmanya Sastrir Sahit Vichar is structural and logical. It is structural in that it both mirrors and controls the structure of the sentence. It is logical in that it indicates the steps of the argument and high - lights the relationship and the meaning by ordering and shaping the expression.

দুই

এই আলোচনাগুলির ভেতর শ্রীসুকুমার সেন কেবলই কালানুক্রমিক বিবরণ দিয়েছেন। শ্রীশিশিরকুমার দাশ যতিস্থাপনের ইতিহাসকে বাংলা বাক্যগঠনের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। কিন্তু তাঁর আলোচনার উপাদান সংগৃহীত হয়েছে বিশিষ্ট লেখকদের রচনা থেকেই।

যতিস্থাপনসহ বাংলা বাক্যগঠনের নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রবণতার ইতিহাসের উপকরণ বিভিন্ন বিশিষ্ট লেখকের ব্যক্তিগত স্টাইলের ব্যক্তিগত ধরণ ধারণে যতটা পাওয়া যায়, সম্ভবত তার চাইতে বেশি পাওয়া সম্ভব সমাজ-রাজনীতি-ইতিহাসের নানারকমের কার্য কারণের যোগাযোগ ও বিন্যাসে । বিশেষত, গদ্যচর্চার ব্যাপকতার অন্যতম প্রধান কারণ রাষ্ট্রকাঠামোর সঙ্গে সমাজের ওতপ্রোত যোগের ফলে জনসংযোগের প্রাথমিক দায় । গদ্যচর্চার প্রাথমিক স্তরে ভাষার চলৎশক্তির আর নমনীয়তার, পেশীর আর পেলবতার, আভাসশক্তির আর অন্বয়ের , শব্দের অর্থময়তা ও অর্থাতিরেকের, বিশেষণের ভারবহনক্ষমতা ও ক্রিয়ার সক্রিয়তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে একই সঙ্গে জনসংযোগের আর শিল্পপ্রকরণের মাধ্যমগুলিতে । বাংলা গদ্যের শিল্পপ্রকরণ (কথাসাহিত্য) তৈরি হয়েছে বাংলাগদ্যের শিষ্টরূপ মোটামুটি নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর -- যদিও জনসংযোগ যার প্রধান দায় এমন গদ্য আর শিল্পরচনা যার প্রধান দায় এমন গদ্যের ভেতর কোনো পূর্বাপরস্তর আবশ্যিকই নয় এবং এই জনসংযোগের গদ্যের সঙ্গেসঙ্গেই বাংলা কথাসাহিত্যের আভাসও রচিত হয়ে যাচ্ছিল । একই সঙ্গে শিল্প ও জনসংযোগের যৌথ দায় কবিতা বা নাটককে বইতে হয় নি ।

ফলে বাংলা গদ্যচর্চার এই প্রাথমিক স্তরে বিশিষ্ট লেখকদের রচনাতে উপাদান সংগ্রহের ধারাবাহিক ইতিহাস যেমন মেলে, তেমনি উনিশ শতকের প্রথমার্ধের সংবাদসাময়িক-পত্রগুলির ব্যক্তি-নিরপেক্ষ রচনাগুলির গদ্যচর্চায় শব্দসংগ্রহ, শব্দনির্মাণ, শব্দবিন্যাস, বাক্যগঠন ও যতিব্যবহার এই উপাদানগুলির গ্রহণ-বর্জন ও ব্যবহারের ধারাবাহিক ইতিহাস সন্ধান সম্ভব ।

গদ্যভাষার সঙ্গে মুখের কথার সাযুজ্য থাকায় ও যুক্তিভিত্তিক রচনা গদ্য চর্চার অন্যতম প্রধান ভিত্তি হওয়ায় গদ্যের ভাষাভঙ্গির সঙ্গে মুখের কথার ভঙ্গির একটা মিল থেকেই যায় । এই মিলের অন্যতম প্রধান লক্ষণ ধরা পড়ে বাক্যের অন্তর্গত যতিগুলির মধ্যে । আবার, গদ্যের যুক্তিশৃঙ্খলার পরম্পরারক্ষারও অন্যতম প্রধান অবলম্বন এই যতি । তাই গদ্যের গড়ন (structure) ও ন্যায় (logic) এই দুই দিক থেকেই যতিব্যবহারের ইতিহাস হয়ে পড়ে গদ্যের গড়নের বিশিষ্টতা অর্জনের ও ন্যায়স্থাপনের নিজস্বতা প্রতিষ্ঠার ওতপ্রোত ।

কিন্তু বাংলা গদ্যের গড়ন ও ন্যায়ের বিকাশ খুব স্বাভাবিক ছিল না । ইংরেজ আগমনের আগে দলিলদস্তবেজে, চিঠিপত্রে ও আইনকানুনে যে-গদ্যভাষা আভাসিত হচ্ছিল তা ইংরেজ আগমনের ফলে নষ্ট হয়ে যায় । উনিশ শতকের গোড়া থেকে যে- বাংলাগদ্যের সূত্রপাত তা ইংরেজপূর্ববর্তী বাংলাগদ্যের আভাসের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য । উনিশ শতক থেকে বাংলাগদ্যের প্রধান উৎস ইংরেজি থেকে অনুবাদ । অনুবাদ হিসেবে যে - গদ্যভাষার শুরু, তার বিকাশে গড়ন ও ন্যায়ের নিজস্বতা না থাকারই কথা । থাকেও নি । তাই বাংলা গদ্যে এমন আপাতত

বিস্ময়কর ঘটনা আছে যে বাংলা গদ্যচর্চার একেবারে প্রাথমিকপর্বেই খুব সুষ্ঠু গদ্যরচনার দেখা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু যেহেতু সেই সৌষ্ঠবের ও সাফল্যের প্রধান ভিত্তি অনুবাদ, তাই তা কোনো ঐতিহাসিক ধারা সৃষ্টি করে না বা ঐতিহাসিক আদর্শও প্রতিষ্ঠা করে না। তাই কোনো একটি রচনায় বা কোনো একজন বিশিষ্ট লেখক তাঁর রচনায় গদ্যভাষার ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি উপকরণ সমাবেশ ঘটানো সত্ত্বেও ততদিন পর্যন্ত তা বাংলাগদ্যের একটি আবশ্যিক উপকরণ হিসেবে গৃহীতই হয় না, যতদিন না বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে গদ্যরচনার পরিমাণগত প্রধান ধারায় তা ব্যবহৃত হয়।

পরন্তু যতিব্যবহার যেমন বাক্যের গড়ন ও ন্যাসের ওতপ্রোত, তেমনি গদ্যের লেখক ও পাঠকসমাজের ভেতর বাক্‌ভঙ্গির মিল, মুখের কথার বাক্যরচনার কৌশল ও যতিব্যবহারের অভ্যাসের সঙ্গেও তার সম্পর্ক প্রায় কার্যকারণের শৃঙ্খলাতেই গ্রথিত। বাংলা গদ্যরচনার প্রথম যুগের লেখক ছিলেন প্রধানত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সমাজ। খ্রিস্টানরি বা হিন্দু রক্ষণশীল ও প্রগতিশীলদের পক্ষ যে-পত্র-পত্রিকা বেরত তার প্রধান লেখকও ছিলেন তাঁরাই। এই পণ্ডিতসমাজের ভেতর সংস্কৃত আদর্শের প্রতি আনুগত্য ছিল নতুন বাংলাগদ্য-রচনার দায়িত্বের চেয়ে বেশি। তাঁদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব ও আনুগত্যবোধের অন্তর্গত বিরোধের ফলে সংস্কৃত রচনা থেকে আদর্শগতবিচ্ছিন্নতা কখনোই সম্ভব হয় নি। ফল, বিশেষ্য-অনুযায়ী বিশেষণ ব্যবহার, অসমাপিকা-ক্রিয়া ব্যবহার না করে ক্রিয়াবিশেষণ ব্যবহার ইত্যাদি সংস্কৃতব্যাকরণসম্মত লক্ষণগুলি যেমন তাঁদের রচনায় দেখা যায়, তেমনি নতুন যতিচিহ্ন ব্যবহার না করে, সংস্কৃত ব্যাকরণসম্মত বাক্যগঠনের দিকেই তাঁদের ঝোঁক ছিল বেশি। রামমোহনের যতিস্থাপনের আদর্শ তাই তাঁরা গ্রহণ করেন নি। হিন্দু কলেজের নব্য ইংরেজিশিক্ষিত ছাত্রেরা ও রামমোহন অনুগামী যুবকেরা যখন সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশ শুরু করেন তখন তাঁরা সংস্কৃত আদর্শ থেকে সরে আসতে চান। কিন্তু নতুন বাংলা গদ্যের আদর্শ তাঁদের সামনে উপস্থিত না থাকায় তাঁদেরও নির্ভর করতে হয় প্রধানত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ওপর। তবু হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ও রামমোহন অনুগামী যুবকেরা পত্রিকা প্রকাশ শুরু করলে নতুন একটি পাঠক-সমাজের কাছে পৌঁছনোর তাগিদ তাঁদের ভেতর দেখা যায়। এই তাগিদ যেমন বাংলা গদ্যের বাক্যগঠনের পরিবর্তন ঘটায়, তেমনি যতিব্যবহারেরও পরিবর্তন ঘটায়।

বাংলা বাক্যগঠনে ও যতিব্যবহারে রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাদর্পন, তত্ত্ববোধিনী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সংবাদসাময়িকপত্রে তা গৃহীত হতে যে কত সময় লাগে তার প্রমাণ মেলে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে-কোনো পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায়। দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, উদ্ধৃতিচিহ্ন — এই সবই হয়তো তখন ব্যবহৃত হচ্ছে — কিন্তু এ-গুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে লেখকের অবহিতি স্পষ্ট নয় বা বাক্যের গড়ন ও ন্যাসের দ্বারা এই ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত

বা এই যতিব্যবহার বাক্যের ও প্যারার গড়ন ও ন্যায়কে নিয়ন্ত্রণ করে না বা সামাজিক কোনো শ্রেণী বা গ্রুপের বাক্‌ভঙ্গির অনুসরণও এতে ঘটে নি। ১৮১৯ সালে দিগ্‌দর্শন পত্রিকার স্কুলবুক সোসাইটি কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত পাঠেই কমা চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে ও ১৮২০ সালে 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার'' বইটিতে রামমোহন রায় ইংরেজি উদ্ধৃতিচিহ্ন, ফুলস্টপ, কমা ও সেমিকোলন -ও ব্যবহার করেছেন। ১৮৪২ থেকে বেঙ্গল স্পেক্টেটরে আর বিদ্যাদর্শন ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রধানত অক্ষয়কুমার দত্তের প্রয়াসে, বাংলা যতিচিহ্ন ব্যবহারের রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তৎসত্ত্বেও ১৮৬০ সালের আগে তা সংবাদ সাময়িকপত্রের গদ্য লেখকদের অধিকাংশের রচনায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি ও সেই রীতি-নীতি বাংলাগদ্যের স্বাভাবিক উপাদানে পরিণত হয় নি। আবার, ১৮৬০ সালের পর পত্র-পত্রিকার পাতায় যতিচিহ্ন সম্পর্কে অনভ্যাসের উদাহরণ প্রায় বিরল। থাকলেও তা কোনো লেখকের ব্যক্তিগত ত্রুটি।

বাংলা গদ্যে এই যতিচেতনা ১৮৬০ সাল নাগাদ গদ্যচর্চার অঙ্গীভূত হয়ে যায়। সংবাদসাময়িকপত্রের ইতিহাস থেকে এই সময়টিকে আরো নির্দিষ্ট করে বলা যায় ১৮৫৮ তে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলা সংবাদসাময়িকপত্রে যতিব্যবহারে অনভ্যাসের জড়তা বা সচেতনতার অভাব বা যতিব্যবহারের শৃঙ্খলা থেকে পেছিয়ে আসার ঘটনা লক্ষনীয় নয়।

তাই বাংলা সংবাদসাময়িকপত্রে যতিচিহ্ন ব্যবহারের প্রবণতাগুলি পরীক্ষা করার কালসীমা ১৮১৮ থেকে ১৮৫৮ এই চল্লিশ বছর, দিগ্‌দর্শন - বঙ্গাল গেজেটি থেকে সোমপ্রকাশ পর্যন্ত।

তিন

১৮১৮ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত বাংলা সংবাদসাময়িকপত্রে যতিব্যবহারের কয়েকটি প্রবণতা লক্ষ করা যায় :

(১) দাঁড়ি ছাড়া কোনো যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হচ্ছে না। কিন্তু দাঁড়ি ব্যবহারেরও কোনো সাধারণ নিয়ম খুঁজে পাওয়া যায় না। এক এক জায়গায় এক এক কারণে দাঁড়ি পড়ছে। তৎসত্ত্বেও বাক্যের গড়ন এমন ও একটি বাক্য থেকে আরেকটি বাক্যের ব্যাকরণগত পার্থক্য এত স্পষ্ট যে কোনো যতিচিহ্ন না থাকলেও পাঠকালে যথাযথ বিরতি গ্রহণ করা সম্ভব। অর্থাৎ গদ্যের ভেতর যতি নিহিত থাকছে। এই প্রবণতাকে 'নিহিতযতি' নামে নির্দিষ্ট করা যায়।

(২) বাক্যের গড়নটাই এমন হয়ে ওঠে যে সেখানে বাক্য থেকে আরেকটি বাক্য পৃথক হতে পারে না, সংযোজক অব্যয়, সাপেক্ষ সর্বনাম বা হেতুবাচক শব্দ ব্যবহার করে বাক্যে বাক্যে এই সংযোজন ঘটানো হয়। ফলে দাঁড়িচিহ্ন ব্যবহার করা সত্ত্বেও তার কোনো নির্দিষ্ট কারণ যেমন বোঝা যায় না, তেমনি পাঠকালে বিরতিগ্রহণেরও কোনো অবকাশ থাকে না — যেন চেষ্টা চলে বাক্যের গড়ন দিয়ে যতিচিহ্ন ব্যবহারকে অপ্রয়োজনীয় করে দেয়া যায় কি না। এই প্রবণতার ভেতর যতিব্যবহার আর বাক্যের গড়নের মধ্যে এক বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই প্রবণতাকে 'উপহিতযতি' (উপ + ধা + ক্ত) নামে নির্দিষ্ট করা যায়।

(৩) দাঁড়ি ছাড়া কোনো যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হচ্ছে না বটে কিন্তু দাঁড়িব্যবহারের একটা নিয়ম যেন অনুসরণ করা হচ্ছে। ফলে দাঁড়িব্যবহারের পরিমাণ বাড়ছে। এই লক্ষণকে 'স্পষ্টযতি' নামে নির্দিষ্ট করা যায়। অন্য কোনো চিহ্ন ব্যবহৃত হচ্ছে না বলে দাঁড়ির সঙ্গে সঙ্গে নিহিতযতিও থেকে যাচ্ছে।

(৪) দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, প্রশ্ন ও বিস্ময়চিহ্ন, উদ্ধৃতিচিহ্ন সবগুলিই ব্যবহৃত হচ্ছে। এই প্রবণতাকে 'যথার্থযতি' বলা যায়।

(৫) কমা ব্যবহার শুরু হওয়ার পর শুধু কমা দিয়েই যতিব্যবহারের সব প্রয়োজন নির্বাহ হতে লাগল, যেমন আগে শুধু দাঁড়ি দিয়ে করা হত। এই প্রবণতাকে 'অনভ্যস্তযতি' বলা যায়।

এই প্রবণতাগুলি কালানুক্রমিক নয়। আবার এও নয় যে সবগুলি প্রবণতাই এই চল্লিশ বছর ধরে সক্রিয় থেকেছে। ১৮১৮ সালের পর যতিচিহ্ন ব্যবহার সম্পর্কে চেতনা ও অভ্যাসে অভাবে অনেক জায়গায় যতিচিহ্ন নিহিত থেকে গেছে। তারপরই ধীরে ধীরে যতিচিহ্নের বিকল্প বাক্য গঠনের একটা চর্চা ১৮৩০ সালের আগে থেকেই দেখা দেয়, যেটাকে 'উপহিতযতি' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু এই 'উপহিতযতি'-র লক্ষণ যখন দেখা দিয়েছে, তখনই আবার 'নিহিতযতি'-র সঙ্গে 'স্পষ্টযতি' ব্যবহারের প্রবণতাও লক্ষ করা যায়। ১৮৩৫ সাল নাগাদ সময় থেকে ১৮৪২-এ বেঙ্গল স্পেকটেটরের প্রকাশকাল পর্যন্ত 'উপহিতযতি'-র প্রবণতা কমে এসে 'স্পষ্টযতি'-র প্রবণতা বাড়তে থাকে। ১৮৪২ থেকে বেঙ্গল স্পেকটেটর, বিদ্যাদর্শন ও তত্ত্ববোধিনীতে যথার্থযতি' ব্যবহার শুরু হয়ে যায় — যদিও তারপরও ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত যতির অনভ্যস্ত ব্যবহার চলতে থাকে।

এই প্রবণতাগুলিকে কোনো সময়ই খুব নির্দিষ্ট লক্ষণে চিহ্নিত করা যায় না। একএকটি প্রবণতার ভেতর নানারকম আভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য দেখা যায়। আবার এই আভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য সত্ত্বেও একটি বিশিষ্টতাও লক্ষ্য করা যায়। এই বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতার মধ্য দিয়েই যতি ব্যবহারের নির্দিষ্টতা আকার নিয়েছে। আবার এই পুরো সময় জুড়েই এই একটি প্রবণতার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভেতর বিভিন্ন উপাদানের বিরোধ-বিচ্ছেদ ও ঐক্য-সমন্বয় ঘটেছে। যতিচিহ্ন যেহেতু গদ্যেরই একটি প্রধান উপাদান, গদ্যের অন্য উপাদানগুলির বিন্যাস ও সম্পর্কও যতিব্যবহারের প্রবণতাকে প্রভাবিত করেছে।

নিহিত যতি

চার

সংবাদসাময়িকপত্রের গদ্যচর্চায় ইংরেজি বা সংস্কৃত বা পারসিক প্রভাব বিশেষত স্পষ্ট হয়ে ওঠে ধর্মীয়, সামাজিক ও আইনসংক্রান্ত দীর্ঘ রচনাগুলিতে। কিন্তু একেবারে প্রাথমিক পর্বে 'সংবাদ'— অংশগুলিতে গদ্যের এক তথ্যগত বিবরণের রীতির দেখা পাওয়া যায়। এই ধরণের রচনার তাত্ত্বিক ভার নেহাত কম বলে ও লেখকের মন্তব্যের লক্ষ নেহাতই আপাতপ্রাসঙ্গিক কোনো বিষয় বলে গদ্য প্রায় আধুনিক বাঙলা সাংবাদিক গদ্যের মতোই, পার্থক্য শুধু যতি ব্যবহারে।

১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮১৯ সমাচার দর্পণ

উদাহরণ ১। মাথা ভাঙ্গা খাল। এ বৎসর মাথা ভাঙ্গা খালের মোহনা প্রায় শুষ্ক হইয়াছে [।] [।] তৎপ্রযুক্ত ভারী বোঝাই নৌকা তাহার উপরে কোন মতে গমনাগমন করিতে পারে না [।] [।] সেখান কার চড়াতে অনেক বোঝাই নৌকা আটক হইয়া রহিয়াছে এবং ছোট২ নৌকাতে জিনিস বাহির করিতেছে [।] [।] তাহাতে জিনিসের অপচয় যথেষ্ট [,] [।] খরচও অধিক ও কালক্ষেপও হইতেছে। ইংগ্লণ্ডীয় গোড়া সৈন্য গাজীপুর হইতে কলিকাতা আসিতেছিল তাহারা একমাস পর্য্যন্ত সেখানে বদ্ধ আছে।

আধুনিক রীতিতে যতিবিন্যাসের তৃতীয় বন্ধনীগত চেষ্টাতেই দেখা যায় যে গদ্যরীতি এই যতিবিন্যাসের সামান্যতম বিরোধীও নয়। গদ্যরীতির ভেতর নিহিত এই যতি বিষয়ের টানে ও গদ্যরীতির নিজস্ব যুক্তিতে কখনো কখনো বাইরেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

<u>৮মে, ১৮১৯, সমাচার দর্পণ</u>

উ. ২ নূতন টাকা। এই সনে যে নূতন টাকা টাকশালে প্রস্তুত হইয়াছে কলিকাতাস্থ দুষ্ট লোকেরা সেই টাকার চতুর্দিক কিনারা উখা দিয়া ঘষিয়া লইয়া পুরাণা কল টাকার মত ছোট করে [,] ইহাতে কেবল তাহারদের লাভ হয়। আমরা শুনিতেছি যে এই কারণ শ্রীশ্রীযুত একটা নূতন মোহরের কারণ ইংগ্লণ্ডে পত্র পাঠাইয়াছেন।

এই উদাহরণে মাঝখানে একটি জায়গায় কমা বা ড্যাশ ব্যবহার করা চলে বটে কিন্তু শেষ খবরটির স্পষ্টতা ও তার আগে প্রয়োজনীয় বিবরণের সরলতার ফলে ঐ কমা বা ড্যাশ অপরিহার্য হয়ে ওঠে না। বরং নতুন টাকা ঘষে পুরোন টাকার মতো আকার করার ঘটনাটি খুব সহজে বলা হয়েছে।

সংবাদসাময়িকপত্রের প্রথম পর্বে অন্তত ছোট ছোট সংবাদে ও মন্তব্যে এই পরিণ গদ্যরীতির প্রায়ই দেখা যায়। তার একটি কারণ হয় তো এই ধরণের রচনায় লেখক খানিকটা দায়-দায়িত্বমুক্ত ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘতর রচনায় বা ছোট সংবাদেও যখন বিষয়গত কোনো জটিলতা আসে, তখন গদ্য যেমন আর সরল থাকে না, নিহিত যতি-ও তত স্পষ্ট থাকে না বা হয় না।

<u>১মে, ১৮১৯, সমাচার দর্পণ</u>

উ. ৩ বিদনূর নবাবের উকীল। বিদনূর শহরের নবাবের উকিল সাহেব গোল-মুন্দীন আপন মুনীবের কোন কর্ম্মে ইংগ্লণ্ডে যাইতেছে [।] তাহার সমাচার পাওয়া গেল যে সে মিসর দেশ দিয়া ফ্রান্স দেশে পঁহুছিয়াছে [।] সে যে কর্ম্মে যাইতেছে তাহার প্রকাশ হয় নাই [।] সে অতিশয় ঐশ্বর্য্যপূর্ব্বক যাইতেছে। একত্রিশ বৎসর হইল এই দেশ হইতে কোন উকীল ইউরোপে যায় নাই [।] ইহার পূর্ব্বে টিপু সুলতানের এক উকীল ফ্রান্স দেশে গিয়াছিল।

মাথাভাঙ্গার খাল বা নূতন টাকা সংবাদলেখকের কাছে যত হালকা বিষয় বিদনূরের নবাবের উকীল বা তাঁর বিদেশ গমন নিশ্চয়ই ততটা নয়। বিশেষত তাঁর প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তও যখন লেখককে টানতে হয়েছে। ফলে এই লেখাটি আকারে ছোট হলেও,

গদ্যরীতির দিক থেকে বেশ জটপাকানো। তৃতীয় বন্ধনীতে যে দাঁড়িচিহ্নগুলির সম্ভাব্য ব্যবহারের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে তার তৃতীয়টির পরের বাক্যটি বিষয়ের দিক থেকে খানিকটা খাপছাড়া অথচ ঠিক ঐ বাক্যটির পরই লেখক একটা দাঁড়ি দিয়েছেন। ঐ বাক্যটি যদি সম্ভাব্য প্রথম দাঁড়ির পরের বাক্য হত, তাহলে প্যারাটিতে রচনার যুক্তিনিরপেক্ষ শৃঙ্খলা অটুট থাকত।

গদ্যরীতির অপরিণতির ফলে গদ্যের শৃঙ্খলা যে ধরণের বাক্যে বা বাক্যাংশে ব্যাহত হচ্ছে সেখানে আচমকা দাঁড়ি পড়ে যায়, যেন লেখকের গদ্যশৈলীর আত্মরক্ষারই এক স্বভাব-তাগিদে আবার ব্যবহৃত দাঁড়ির সঙ্গে প্রায় সম্পর্কশূন্য ভাবেই গদ্যের ভেতরে ভেতরে দাঁড়ি বা কমা নিহিত থেকে যায়। দীর্ঘতর রচনায় নিহিত যতি ও ব্যবহৃত যতির এই বিরোধ আর গদ্যরীতির বিশৃঙ্খলা কখনো কখনো স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

উ.৪। <u>২৭ মার্চ ১৮১৯, সমাচার দর্পণ</u>

শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের বিবাহ। মুরশেদাবাদের কাশীম-বাজারের শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের শুভবিবাহ ১৬ ফাল্গুণ হইয়াছে [।] তাহার ব্যাওর্দ্দ দুই লক্ষ টাকা [।] সময় মতে জিনিসের কম দামে [,] অধিক ব্যয়ে যেমত বিবাহ হইয়াছে [,] এমত বিবাহ তদ্দেশে কাহার হয় নাই ও কেহ দেখেন নাই [।] ঝাড় বাগীচা কাগজের ও আবরক ও মুখী বাগীচা ও নানাজাতি বৃক্ষ সকল আম্র কাঁঠাল আনারস কামরাঙ্গা দাড়িম্ব আতা ও ফুল নানাজাতি নির্ম্মিত হইয়াছিল [।] বিজ্ঞ মনুষ্যেতে চারিদন্ড দৃষ্টি করিলে জ্ঞান করিত যে নির্ম্মিত দ্রব্য নতুবা ছোট২ লোকে প্রকৃত জ্ঞান করিয়াছে এমত উত্তম কারিগরি। ইহারদিগের এক২ বাগীচার মূল্য তিনশত চারিশত [,] তাহাতে মোমবাতি সংযোগে [,] এমত পাঁচশত বাগীচা [,] শেলাসী ঝাড় তিনহাজার [,] শেলাসী বাগিচা এক হাজার [,] মোমবাতি দুই শত মন [,] রওশনিরোশনী হয়। নাএব মজলিস ইস্তক ৫ ফাল্গুণ নাগাদ ১৫ রোজ দশ তাএফা বাই ও তিন তাএফা ভাঁড় [,] ইহা সেওয়ায় কাওয়াল গুনী লোক অনেক [।] ঐ ৫ তারিখে শ্রীযুত কোঙর বাহাদুর আইবড় খান [।] পরে স্থানে২ যেখানে নিমন্ত্রণে যান নানাবিধ বাদ্য ও নানাবিধ সলতনৎ এবং রাজ আভরণে ভূষিত অপূর্ব্ব রূপ্য নির্ম্মিত যানারোহন করিয়া গমনাগমন করিতেন [।] বিবাহের মজলিসে এক২ দিন এক২ কমরেক্কা লোকের গমন হইয়াছিল [।] তাহার বিস্তারিত [—] প্রথম দিবস [,] নিজ আমলাতে বেষ্টিত [,] দ্বিতীয় দিবস [,] গ্রামস্থ যাবৎ মহাজন ভদ্রলোক ই: [,] তৃতীয় দিবসে নাগাদ অষ্টম দিবস ১৩ ফাল্গুণ পর্য্যন্ত

[।] যাবদীয় হাকীমন [,] আমলা [,] আপীল [,]
অদালত ও ফৌজদারী ও কালেক্টরি ও পারমিট ও কোম্পানীর কুঠীর আমলা ও
নেজামতের আমলা ও শহরের যাবদীয় সাহেবান [,] আলীসান ও
বহরমপুরা ও গয়রহ সাহেব লোক ও বিবিলোক ও বাবালোক একত্র এবং
শ্রীযুত নবাব সয়ফজঙ্গ বাহাদুর একত্র [।] মজলিসে নাচ ও গান ও
বাদ্য ও আতস নানাবিধ সকল তামাশা দৃষ্টি করিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়াছেন।-
. . . [স. সে. ক ১, পৃ ২৩৮]

বিষয়ের ভার না থাকলেও ও মন্তব্যের দায় না থাকলেও লেখাটি বড় বলে ও বিবরণে নানাধরণের ঘটনা আসছে বলে উদ্ধৃতিটিতে বাক্যগঠন অনেকক্ষেত্রে ব্যাকরণসম্মত নয় । আমাদের নির্দেশিত দ্বিতীয় দাঁড়ির পরের বাক্য ও তৃতীয় দাঁড়ির পরের বাক্যের পদবিন্যাসে অর্থবোধের বাধা ঘটে । তদুপরি একটি ধারাবাহিক বিবরণে ক্রিয়ার কালসাম্য থেকে যে চলমানতা আসে, এই অংশটিতে তাও নেই । সংবাদসাময়িকপত্রে গদ্য চর্চার প্রাথমিক পর্বে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ রচনায় এগুলি সাধারণ লক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও আরবী-ফারসী শব্দের প্রচুর ব্যবহারে উদ্ধৃতিটি বিশিষ্ট ।

একেবারে শেষের দাঁড়িটিকে বাদ দিলে প্যারার ভেতরে মাত্র দুইবার দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়েছে । যে দুই জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে, ঠিক সেই দুইটি জায়গাতেই দাঁড়ি কেন পড়ল ও অন্য কেন পড়ল না এর কোনো আপাত কারণ নেই । তবু লক্ষ করলে দেখা যায়, কাপড়ের গাছপালা ফুলফল কত চমৎকার বনানো হয়েছিল বলতে গিয়ে প্রথমবার আর আলোর কত রোশনাই হয় বল
গিয়ে দ্বিতীয়বার দাঁড়ি পড়েছে । মাত্র ঐ দুটি বর্ণনাই লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল হয়তো নি
দেখেছেন হতে পারে, —— বিবাহের বাকি বিবরণ তো তাঁর কানে শোনা । অর্থাৎ বাক্য গঠন বা
অর্থবোধের সুবিধের জন্য নয়, শ্বাস নেওয়ার জন্যও নয়, কণ্ঠস্বরের অনুসরণেও নয় —— দাঁড়ি ব্যবহৃত হচ্ছে বড়জোর লেখকের প্রত্যক্ষণের উত্তেজনায় ও সেই প্রত্যক্ষণের সঙ্গে গদ্যরীতির সাযুজ্যে
টেনশনে, আচমকা, হতে পারে অজান্তেই, একবারও ব্যবহৃত না হতে পারতো । কিন্তু ভাষাগত জড়তা ও দাঁড়ি ব্যবহারের এই চমক সত্ত্বেও এই উদ্ধৃতিটিতে যতিচিহ্ন না থাকায় কিন্তু বাক্যবিন্যা
কোনো জটিলতা ঘটে নি । কোনো বাক্যের কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়েও আধুনিক রীতিতে প্যারা
যে যতিচিহ্নিত করা সম্ভব তা খুবই স্পষ্ট - উদ্ধৃতিটিতে তৃতীয় বন্ধনীতে সেই চেষ্টার সাক্ষ
ছাড়াও ।

অর্থাৎ যতিচিহ্ন নিরপেক্ষভাবেই প্যারাটিতে বাক্যগুলি এমনভাবে গড়ে উঠেছে যাতে সমাপিকা ক্রিয়া বাক্যগুলিকে পরস্পর থেকে পৃথক রাখতে পেরেছে। এই প্যারাটিতে বিশেষত দুটি বাক্যের ভেতর কোনো সময়ই কোনো সংযোজক পদ ব্যবহৃত হয় নি। যে ২২ বার সংযোজক পদ ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রথমটি ব্যতীত প্রত্যেকটিই দুটি শব্দের ভেতর সংযোজন ঘটিয়েছে — কোনো সময়ই দুটি বাক্যের ভেতরে নয়।

যতির প্রয়োজন বাক্যগঠনের এই সরলতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যতি বাক্যের ভেতর নিহিত থেকে যাচ্ছে। যে- যতি প্রকাশ্যত ব্যবহৃত হচ্ছে তা বাক্যের গড়ন বা লেখকের অভিপ্রায় বা অন্য প্রয়োজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। বাংলার সংবাদসাময়িকপত্রের প্রাথমিক স্তরে এই নিহিত যতি অনেকদিন পর্যন্ত কার্যকর ছিল। কিন্তু এই ধরণের দীর্ঘ রচনায় ব্যবহৃত যতি ও নিহিত যতির ভেতর পারস্পরিক সম্পর্কের অভাব থেকে পারস্পরিক বিরোধিতার আশঙ্কা থেকে যায়।

গদ্যরীতিরই অন্তর্গত এই বিরোধিতা যতিস্থাপনকে যেমন নিয়মিত হতে দেয় না, তেমনি গদ্যরীতির বিকাশেও বাধা দেয়। কিন্তু যতিস্থাপন ও গদ্যরীতির এই বিরোধিতার মূল নিহিত ছিল গদ্যরীতির সঙ্গে সামাজিক অন্বয়ের অভাবের ভেতর। তাই এই আদিপর্বে দাঁড়িচিহ্ন ব্যবহারের একটি সুসঙ্গত উদাহরণের ভেতরও দেখা যায় গদ্যের প্রসঙ্গ - অনুপ্রসঙ্গ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব। ফলে দাঁড়িচিহ্নের কিছুটা শৃঙ্খলাও গদ্যের আত্ম আবিষ্কার ঘটায় না।

উ. ৫। <u>২৩ সেপ্টেম্বর, ১৮২৩, সমাচার দর্পণ</u>

দেবীপূজা। হিন্দুস্থানের মধ্যে শরৎকালীন দেবীপূজা অনেক স্থানে হয় । বা, বা — । বিশেষত গঙ্গানদীর উভয় পার্শ্বে অত্যধিক সমারোহ হয় । যদি কোন ভাগ্যবান হিন্দু এ পূজা না করে তবে রীতি আছে যে রাত্রিযোগে প্রতিমা আনিয়া লোকেরা সঙ্গোপনে তাহার চণ্ডীমণ্ডপে রাখিয়া যায় । বা ; বা, বা — । পরে গৃহস্থ ব্যক্তি জানিয়া ধর্ম্মভয়ে কিংবা লোকভয়ে যে রূপে হয় তাঁহার পূজা করে। <u>তাহাতে</u> গত সপ্তাহে ৫ আশ্বিন মঙ্গলবার রাত্রে বেনঘরিয়া গ্রামের বালকেরা ঐ গ্রামের কোন ভাগ্যবানের বাটীতে এক দোয়াটীয়া প্রতিমা রাখিয়া আসিয়াছিল । । ৬ আশ্বিন বুধবার প্রাতে সেই ভাগ্যবান আপন বাটীতে ঐ দোয়াটীয়া প্রতিমা দেখিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইল ও আপন ঘর হইতে দা আনিয়া প্রতিমাকে শতধা করিয়া আপন পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়া বাঁশ ও কাষ্ঠ দ্বারা চাপা দিয়া রাখিল। যাহারা ঐ প্রতিমা

রাখিয়া আসিয়াছিল তাহারা দেখিল যে যেখানে প্রতিমা ছিল সেখানে নাই [বা ; বা — বা,] পরে অন্বেষণ করিতে২ জানিল যেপ্রতিমা কাটিয়া পুষ্করিনীতে নিক্ষেপ করিয়াছে [।] অপর তাহারা ঐ প্রতিমা সরকারি স্থানে আপনারা পূজা করিবেক নিশ্চয় করিয়া প্রতিমা আনিতে গিয়াছিল [। বা ; বা — বা 'কিন্তু' তাহাতে সে ভাগ্যবান তাহাতে সে ভাগ্যবান ব্যক্তি তাহাদিগকে প্রতিমা উঠাইয়া লইতে না দিয়া মারপিট করিয়া বিদায় করিল ।

পূর্ব্বাবধি এই রীতি চলিয়া আসিতেছে তাহাতে সেখানে এইরূপে তাহার আগমন হয় সেখানে কোনমতে অন্নবস্ত্রে পুরস্কৃতা হইয়া দশমীর দিবসে জলমগ্না হইয়া থাকেন কিন্তু আগমনমাত্রে এরূপ পুরস্কৃতা হইয়া জলে মগ্না হইতে হিন্দুস্থানের মধ্যে কেহ দেখে নাই ও শুনে নাই ।-- [সং. সে. ক. ১, পৃ ২৩৩] ।

রচনাটিতে তিনটি ভাগ আছে । দাঁড়ি দিয়ে শিরোনামটি নির্দিষ্ট হয়েছে ও বক্তব্য একটি ভিন্ন প্যারায় করা হয়েছে । প্রথম প্যারায় ঘটনার বিবরণ — এই বিবরণে তিনটি জায়গায় দাঁড়ি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে । দাঁড়ি দিয়ে আলাদা করা এই তিনটি অংশে তিনটি সূত্র-বিষয়ের বিবরণ । প্রথম অংশে হিন্দুদের বিশেষ রীতির উল্লেখ । দ্বিতীয় অংশে 'বেলঘরিয়া গ্রামের বালকেরা ও 'সেই ভাগ্যবান্' কি করেছে তার ধারাবাহিক বিবরণ । তৃতীয় অংশেও দ্বিতীয় অংশের ধারাবাহিকতায় 'যাহারা ঐ প্রতিমা রাখিয়া আসিয়াছিল তাহারা' ও 'সে ভাগ্যবান ব্যক্তি' কি করল তার বিবরণ ।

অর্থাৎ, এই প্যারাতে দাঁড়িচিহ্নের ব্যবহারের একটা নির্দিষ্টতা আছে । দাঁড়ি দেয়া হয়েছে প্রসঙ্গান্তর বোঝাতে । যতি চিহ্নের এটি একটি স্বীকৃত ব্যবহার । কিন্তু প্রসঙ্গান্তর বাছাই-এর ক্ষেত্রে লেখক একটি প্রসঙ্গের ভেতরে যে- অনুপ্রসঙ্গ আছে, তাকে কোনো যতিচিহ্নের দ্বারা নির্দিষ্ট করেন নি । এই অনুপ্রসঙ্গ বোঝাতে দাঁড়ি, সেমিকোলন বা ড্যাশ ব্যবহার করা হয়ে থাকে । বর্তমান রীতিতে আলোচ্য প্যারাটির যতিচিহ্ন ব্যবহার কি হতে পারে তা প্যারাটির উদ্ধৃতির ভেতর তৃতীয় ব্র্যাকেটে দেখানো হয়েছে । অনুপ্রসঙ্গ নির্দিষ্ট করার এই অক্ষমতার ফলে বাংলা সাময়িকপত্রের গদ্যের প্রাথমিক পর্বে যতিচিহ্ন গদ্যের গড়নের (structure) অঙ্গ গণ্য হতে পারে নি ।

আলোচ্য প্যারাটিতে অন্তত তিনটি জায়গায় দাঁড়ি ছাড়া অন্যকোনো চিহ্ন ব্যবহারই করা যায় না অথচ লেখক কোনো চিহ্নই ব্যবহার করেন নি । এই তিনটি জায়গা বিষয়গতভাবে অনুপ্রসঙ্গ নয়, প্রসঙ্গান্তর । পরন্তু তিনটি জায়গাতেই চিহ্নের ব্যবহার একটি কাজের সমাপ্তি বোঝায় । শুধু অনুপ্রসঙ্গ নির্দিষ্ট করার অক্ষমতাই নয়, গদ্যের গড়নের (structure) অপরিহার্য উপকরণ

হিসেবে যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হচ্ছিল না। ফলে গদ্যের গড়ন ও যতিচিহ্নের ব্যবহার প্রায়ই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গদ্যে প্রসঙ্গ, অনুপ্রসঙ্গ বা প্রসঙ্গান্তর চিহ্নিত করাটা কোনো ব্যাকরণের বা রচনানৈপুণ্যের প্রশ্ন নয় —— বিষয়ের প্রতি লেখকের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন। বর্তমান উদাহরণে এ-রকম কোনো একটি দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় না। তেমন দৃষ্টিভঙ্গি নিরপেক্ষ বা বিরহিত রচনাও সংবাদসাময়িকপত্রে গ্রাহ্য হতে পারে। কিন্তু এই উদাহরণটিতে আসলে দৃষ্টিভঙ্গির বিভ্রাট ঘটেছে। মিশনারিদের কাগজের হিন্দু পৌত্তলিকতাবিরোধী একটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে। অথচ ব্রাহ্মণ সংস্কৃত পন্ডিতের আবার অন্য দৃষ্টিভঙ্গি —— তিনিই লেখক। পরন্তু সংবাদসাময়িকপত্রের একটা নিরপেক্ষতার ভূমিকা। দৃষ্টিভঙ্গির এই বিভ্রাটে বাংলাগদ্যের লেখকদের কাছেই গদ্যের স্বরূপ তাই স্পষ্ট হতে পারছিল না।

একটি ঘটনার বিবরণ যখন দেওয়া হয় তখন সেই বিবরণ বিষয়গতভাবে এক নিজস্ব ধরণের ধারাবাহিকতা অর্জন করে। বাংলা সাময়িকপত্রের গদ্যের এই প্রাথমিক পর্বে বিষয়ের নিজস্ব এই ধারাবাহিকতা সম্পর্কে অনবহিতির ফলে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার সময় 'অপর' 'তাহাতে' এ-রকম শব্দের অত্যন্ত ব্যবহারের সাহায্য নেওয়া হত। আলোচ্য অংশে তিন জায়গায় যথাক্রমে 'তাহাতে' 'অপর' 'তাহাতে' এই তিনটি শব্দ অর্থহীন ভাবে ও বাক্যের গড়নের সঙ্গতিহীনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা স্পষ্টতই সংস্কৃত আখ্যানরীতির প্রসঙ্গান্তর পদ্ধতির অথ, অনন্তর, অপিচ, তৎচ —— ইত্যাদি অব্যয়তুল্য ব্যবহারের প্রভাবে ঘটেছে। এই ব্যবহার যতিচিহ্নের ব্যবহারকেও প্রভাবিত করেছে। হাতে এই ধরণের শব্দ থাকলে প্রসঙ্গান্তর সূচনায় যতিচিহ্নের ওপর অনন্য নির্ভরতা আর লেখকের থাকে না।

প্রাথমিক পর্বে বাংলা সংবাদসাময়িকপত্রের রচনাগুলিতে দৃষ্টিভঙ্গির বিভ্রাট গদ্যের উপাদান সমাবেশে যে- বিঘ্ন ঘটায় তা দূর করতে বা এড়াতে বাতা থেকে আত্মরক্ষা করতে লেখককে বাধ্যতই কতকগুলি আনুষ্ঠানিক (formal) ব্যাকরণগত পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সেখানে তার একমাত্র নির্ভর হয় সংস্কৃত ব্যাকরণ। যতক্ষণ পর্যন্ত সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি বাংলা বাক্যগঠনের রীতিকে গ্রাস না করে, ততক্ষণ নিহিত যতি কার্যকর থেকে বাক্য চলমান রাখতে পারে। আর নিহিতযতি কার্যকর বলেই আলোচ্য সংবাদপত্রের গদ্যভাষা জড়তামুক্ত, বিবরণে গতি আছে, বাক্য-গঠনে সংস্কৃত বা ইংরেজি রীতির এমন কোনো যান্ত্রিক প্রভাব নেই যা রচনাটিকে অনড় করে, বাক্যগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়, একটি বাক্য থেকে আরেকটি বাক্য বেশ সহজে আসে। যতিচিহ্নের সঙ্গে বাক্যের গড়নের ও ন্যায়ের (structure and logic) অসঙ্গতি সত্ত্বেও এটা সম্ভব হয়েছে বটে কিন্তু এটা তো গদ্যের বিকাশের ফলে সম্ভব হয় নি - সম্ভব হয়েছে বাক্যের ভেতরে, রচনার ভেতরে কতকগুলি জায়গা ফাঁক থেকে গেছে — যে-ফাঁক আজও আমরা যতিচিহ্ন দিয়ে ভরাতে পারি। কিন্তু সামাজিক বিষয়ের প্রতি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা যতিচিহ্নসহ গদ্যের উপকরণগুলিকে

যে-শৃঙ্খলায় বিন্যস্ত করতে পারে, সেই শৃঙ্খলার অভাব লেখককে ঐ ফাঁক ভরাবার এক কৃত্রিম উপায় খুঁজতে ব্যস্ত করবে। তখন আর যতি নিহিত থাকে না, যতি লুপ্ত হয়ে যায়।

তাই বাংলাগদ্যের বিকাশে আদিপর্বে যেমন সরল সহজ বাংলা গদ্যের জায়গায় সংস্কৃত ঘেঁষা গদ্য দেখা দেয়, তেমনি নিহিত যতির কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে সেখানে আসে যতির উপাধি নিয়ে উপস্থিতযতি, যা আসলে যতিই নয়, শব্দ মাত্র।

কিন্তু সেই উদাহরণের বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে এমন একটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে যেখানে বিষয় ও লেখকের দৃষ্টি-ভঙ্গির ঐক্যে যতিবিন্যাসসহ গদ্যরীতিটি সার্থক বাঙালী গদ্যরীতি হয়ে উঠতে চায়।

উ. ৬। <u>২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২১ সমাচার দর্পণ</u> -

> বাবুর উপাখ্যান। অমরাবতী নগরে রাজচক্রবর্তী নামে একজন অতিবড় ধনবান কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। চক্রবর্তী প্রথমাবস্থায় রাজকীয় ও জমিদারী সংক্রান্ত নানাপ্রকার বড়২ কর্ম্ম করিয়া ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন।
>
> তিনি বড় বিজ্ঞ মন্ত্রী [,] বুদ্ধিমান [,] আদালতের রীতিজ্ঞ <u>এবং</u> বড় চাতুরিয়া প্রচ্ছদ্দরূপে ব্যক্ত হইবাতে সুলতান আহম্মদ খলীফা [,] ভারতবর্ষের ব্যাপক মহাজন [,] তাহাকে ডাকাইয়া আফীমের কুঠীর দেওয়ানি কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। আফীম মহলের কর্ম্ম বড় [,] উপার্জ্জনের সীমা নাই। অত্যল্প খরচে আফীম প্রস্তুত হইয়া চীন দেশে যায় [। বা ,] সেখানে বিক্রয় হইয়া সুলতান খলীফার যথেষ্ট লাভ হয়। দেওয়ান চক্রবর্তী দেখিলেন যে আকাঙক্ষামত ধনবৃদ্ধি হয় না অতএব কৃত্রিম অকৃত্রিম আফীম প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাহাতেই তিনি অসংখ্য ধনশালী হইলেন। কিন্তু চক্রবর্ত্তী নিঃসন্তান [,] সর্ব্বদা দুঃখী [,] কহেন যে আমার এত বড় নাম ডুবিল [,] নির্ব্বংশ হইলাম [,] সন্তান নাই [,] ধন কাহাকে দিয়া যাইব। তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বদা ... যাগ দান করেন। [স. সে. ক. ১ পৃ ১৬]

এটি উপাখ্যানের প্রথম অংশ। তখন কমা বা অন্য কোনো যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হওয়া শুরু হয়
আলোচ্য অংশটিতে লেখক শুধুমাত্র দাঁড়ি চিহ্নই দিয়েছেন। কিন্তু কোথাও দাঁড়ির সঙ্গে কা
বৈপরীত্য নেই। বর্তমান রীতি অনুযায়ী আমরা অংশটিতে কমা চিহ্নগুলোই শুধু বসাতে পারি,
একটি জায়গায় দাঁড়ি দেয়া চলে। এই একই রচনার প্রথমাংশের তুলনায় দাঁড়ি কম ব্যবহৃত হ
সত্ত্বেও সমাপিকা ক্রিয়ার ওপর গঠিত সরল বাক্যে, ক্রিয়ার কাল ও রূপের ঐক্যে, নিহিতযতি
বোঝাতেও কার্যকর থেকে যায়।

"পরদিনে বাটীর তাবৎ লোক ব্যস্ত [,] কর্ম্মের ভিড়ের সীমা নাই [,] বাবু কুঠী যাইবেন। বাবু প্রাতে স্নান করিলেন [,] কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া উত্তম জামা জোড়া বহুকালে পরিধান করিয়া বো বিন্যাস পূর্ব্বক অদ্ভুত উত্তম গাড়ীতে আরোহন করিলেন [,] সঙ্গে চারিজন ব্রজবাসী লাল পাগড়ী-ওয়ালা বাঁকা হাবরা চলিল গাড়ী ঘর২ শব্দে দুর্ব্বিধ (?) বাজারে পহুঁছিল [।] সেখানে হাজী হাদী সাহেবের খেজুরের দোকানে উত্তীর্ণ হইলেন [।] হাদী সাহেব বড় লোক [,] বাবুর সহিত বড় প্রণয় [,] বাবুকে বসিতে চৌকি দিলেন [।] পরে উভয়ে অন্য ভাষায় আলাপ হইল [।] বাবুর বাক্যশক্তি তাদৃশ নাই তথাচ বড় লোক গাটমিট করিয়া কহিলেন। হাদী সাহেব বাবুর প্রতি কহিলেন যে অদ্য বড় গরমী [,] তুমি মোটা হইয়াছ [,] তোমার কত টাকা আছে [,] টাকার কি দর [,] এক্ষণে সুদ বাজারে টাকার অল্পতা কেন হইল [,] বানিয়ারা ইহার কি বলে। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন [,] সাহেব [,] এদেশে আর একজন কাজী আসিতেন শুনি [,] সত্য কি না [,] লড়াইয়ের কি খবর [,] এত জাহাজ আসিতেছে কেন ইত্যাদি [।] আলাপ হইয়া বাবু ব্রজবাসীদিগকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন যে একজন দেখ মোল্লা ফিরোজ ঘরে ঘরে আছেন কি না [,] আনতানি বদ্রিগুও সাহেব ঘরে হাজিরা খনে কি না [,] দ্বিতীয় জনকে **কহিলেন** যে দেখ এয়াগু সাহেব নিশ্চিন্ত বসিয়া আছেন কি না জানিয়া আইস তবে আমি যাইব [।] ইহা কহিয়া গাড়ীতে সওয়ার হইলেন ও নিলাম ঘর হইয়া বাজার দিয়া বাবু বাটী আইলেন [।] বাটীর লোক সকলে ক্লান্ত [।] বড় গরমি [,] বাবু অভুক্ত [,] আহার হইলে হয় সুতরাং সকলেই অতিব্যস্ত [।] পরিশ্রম হইয়াছে [,] শিরঃপীড়াও হইল [,] আহার সুন্দররূপে করিতে পারিলেন না [,] যৎকিঞ্চিৎ খাইয়া শয়ন করিলেন। [ঐ]

একই রচনার অপেক্ষাকৃত ছোট প্রসঙ্গে যেখানে ১বার দাঁড়ি দেয়া হয়েছিল, রচনাটি বেশ খানিকটা এগনোর পর এই শেষাংশে সেখানে মাত্র ৪ বার দাঁড়ি পড়েছে। প্রথম দাঁড়ি পড়েছে 'কুঠী যাইবেন' এই ঘোষণায়। দ্বিতীয় দাঁড়ি পড়েছে বাজারে পৌঁছনোর পর। তৃতীয় দাঁড়ি পড়েছে হাদী সাহেবের কথার পর। চতুর্থ দাঁড়ি প্যারার শেষে। তৃতীয় দাঁড়ির পরে বাবুর কথার শেষে যদি একটি দাঁড়ি থাকত তাহলে দাঁড়ি ব্যবহারের যুক্তি হত প্রায় নিখুঁত। দাঁড়ি ব্যবহার সংখ্যায় কম হলেও প্রথমাংশের তুলনায় এই দ্বিতীয়াংশে স্টাইলের কোনো পরিবর্তন ধরা পড়ে না। একমাত্র শেষের দিকে একটি 'সুতরাং' ব্যতীত লেখক এখানেও কোনো সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করেন নি।

সং বাদসাময়িকপত্রের গদ্যচর্চার এই আদিযুগে সামাজিক নক্সা, ব্যঙ্গমূলক রচনা, হালকা লেখার ভেতর গদ্যের একটা নিজস্ব বাঙালি চেহারা ধরা পড়ছিল বলেই, এই ধরণের রচনায় যতিচিহ্নের অসম্পূর্ণ ব্যবহারও গদ্যরীতির সামগ্রিকতায় একধরণের সম্পূর্ণতা পেয়েছিল। লেখক ও বিষয়ের এই ঐক্য অবশ্য খুব বেশি ঘটে নি। তাই ব্যাপকতর সেই সব ক্ষেত্রে বাক্যের গড়ন আর ইংরেজি যতিচিহ্ন হয়ে ছিল পরস্পরবিচ্ছিন্ন। বাক্যের ভেতর নিহিত যতির অবকাশে গদ্যের প্রাথমিক গতিশীলতা তাই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিগড়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। একই বিষয় নিয়ে দুটি লেখার তুলনা দিয়ে তা স্পষ্ট করা যেতে পারে।

উ. ৭। ৭ এপ্রিল ১৮২১, সমাচার দর্পণ

মহামহাবারুণী। গত শনিবারে মহামহাবারুণীর যোগে গঙ্গা স্নানে অনেক২ দেশীয় লোক আসিয়াছিল [।] তাহাতে যোকাম বৈদ্যবাটীতে উৎকল দেশীয় অনেক লোক আসিয়াছিল [।] তাহারা অধিক পথ গমনেতে দুর্ব্বল হইয়া অতিশয় প্রচন্ড রৌদ্রের উত্তাপেতে উত্তপ্ত জল পান করিয়া ওলাউঠা রোগে অনেক লোক পথে ও যোকাম বৈদ্যবাটীতে মরিয়াছে এবং তদ্দেশস্থ লোকেরা অতিশয় নির্দয় [,] ঐ বৈদ্যবাটীতে যে২ লোকের ওলাউঠা রোগ হইয়াছিল তাহারা অবসন্ন হইয়াছিল তাহারা অবসন্ন হইলে তাহার সঙ্গী লোকেরা ত্যাগ করিয়া গেলাইন। ইহাতে গঙ্গার তীরে যে২ অবসন্ন লোক ছিল তাহার মধ্যে অনেকে জোয়ার সময়ে সজীব গঙ্গা পাইয়াছে। তথাকার দারোগা অনেক লোক উঠাইয়া ঘোল ও দধি প্রভৃতি খাওয়াইয়া ছিল। তাহার মধ্যে অনেক মরিল [,] কথচিৎ কেহ২ বাঁচিয়াছে।

মোং ত্রিবেণীতে মহামহাবারুণীতে ছেষট্টি লোক মরে [।] ইহার মধ্যে ওলাউঠা রোগে ৩৩ ত্রিশ জন ও লোকের চাপাচাপিতে ছত্রিশজন মরে [।] বৃদ্ধ ৪ চারিজন ও বালক ৭ সাতজন [,] অবশিষ্ট সকলি যুবা। এই সকল লোক গ্রাম উড়িষ্যা প্রদেশীয় [,] অনং দেশীয় অল্প। ঐ যোকামে দারোগারা অনেকে আসিয়া তদারক করিয়াছিল কিন্তু কিছুই হইল না কারণ লোকের হুড়াহুড়ে লোক মারা পড়িয়াছে। (স. সে. ক. ১ পৃ ২৩৫)।

উদ্ধৃত সং বার্তির প্যারাভাগ অত্যন্ত নির্দিষ্ট। প্রথম প্যারাতে ওলাউঠার বিশদ বিবরণ ও দ্বিতীয় প্যারায় এই সমস্ত ঘটনার নির্যাস হিসেবে নিরপেক্ষ তথ্য —— সং বাদিক তথ্যের

নিরপেক্ষতায় "লোকের চাপাচাপিতে" মৃত্যুর বীভৎসতাও অস্পষ্ট হয়ে যায় । অপেক্ষাকৃত ছোট এই দ্বিতীয় প্যারাটিতেই ৩ বার দাঁড়ি দেয়া হয়েছে — দীর্ঘতর প্রথম প্যারাটিতে মাত্র ৪ বার । দ্বিতীয় প্যারার দাঁড়ি দেওয়ার ভেতরে একটা নিয়ম লক্ষ করা যায় । মৃত্যুর তালিকা দিয়ে প্রথম দাঁড়ি ও মৃতদের দেশপরিচয় দিয়ে দ্বিতীয় দাঁড়ি । তৃতীয় দাঁড়িটি প্যারার শেষ দাঁড়ি । প্রথম প্যারার 'তাহারা অবসন্ন হইলে তাহার সঙ্গী লোকেরা ত্যাগ করিয়া পলাইল" এই নির্দয় অংশটির পরই প্রথম দাঁড়িটি পড়েছে । তারপর নিয়মিতভাবেই এক-একটি বাক্যের শেষে দাঁড়ি পড়ে । কিন্তু খানিকটা তথ্যাতিরিক্ত আত্মপ্রক্ষেপে প্রথম দাঁড়িটির আগে যে কোনো যতিচিহ্নই ব্যবহৃত হয় না তার ফলে কিন্তু বাক্যগুলির পারস্পরিক পার্থক্য নষ্ট হয় নি, বিবরণের ধারাবাহিকতারও ক্ষতি হয় নি । পাঁচটি সমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা নির্দিষ্ট নিহিতযতির ভিত্তিতে এই পার্থক্য ও ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে । উদ্ধৃতিটিতে সাপেক্ষ সর্বনামসহ সংযোজক পদ ব্যবহৃত হয়েছে মোট ৯ বার । তার ভেতর ৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে শব্দের মধ্যে । বাকি ৫ বারের ভেতর ২ বারই ব্যবহৃত হয়েছে সুগঠিত শেষ বাক্যটিতে ।

উ ৮ । <u>৩ এপ্রিল ১৮২৪ সমাচার দর্পণ</u>

মহামহাবারুনী । মোং চক্রদ্বীপে এই বৎসর <u>যে</u> প্রকার লোকসমারোহ হইয়াছিল <u>এমত</u> <u>প্রায়</u> কখন হয় **নাই** <u>যেহেতু</u>ক পূর্বপশ্চিম উত্তরদক্ষিণ চতুর্দিগের লোক দশ দিবসের পথ হইতে আসিয়াছিল <u>কিন্তু</u> ইহার মধ্যে বৈদ্যবাটীতে ওলাউঠারোগে অধিক লোক মারা গিয়াছে (।) ইহাতে বোধহয় যে ওলাউঠাও বুঝি যোগেতে বৈদ্যবাটীতে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিল এবং সেখানে তাহার শাসক কেহ না থাকাতে অবাধিতরূপে ঐ সকল বিদেশীয় যাত্রিকেরদের উপর আপন পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছে । [স. সে. ক. ১, পৃ ২০৫] ।

এই অংশটির গড়নই এ-রকম যে একটিমাত্র জায়গা ছাড়া আর কোথাও দাঁড়িদেয়ার অবকাশটুকুও রাখা হয় নি । যে, এমত, যেহেতুক, কিন্তু, এবং —— এই সংযোজক ও হেতুবাচক পদগুলি ব্যবহারের ফলে একটি বাক্যের সঙ্গে আর একটি বাক্য এমন জুড়ে গেছে যে প্যারাটিকে মাত্র দুটি ভাগে ভাগ করা চলে ।

এই ভাগ কোনো প্রকাশ্য যতিচিহ্নের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নি বা এই দুই ভাগের মাঝখানে কোনো যতি নিহিতও নেই । কারকবিভক্তি ও সমাসে শব্দের সঙ্গে শব্দের সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সংস্কৃত বাক্য যেমন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে যেতে পারে লেখকের পছন্দমতো আর যতিচিহ্ন যেমন সেখানে অবান্তর হয়ে যায় সেই আদর্শে এই বাক্যগুলি রচিত ও গ্রথিত হয়েছে । গদ্যচর্চায় প্রয়োজনীয় উপকরণের সন্ধানে সংবাদ সাময়িকপত্রের গদ্যে বাক্যের অনড় গড়নে যতিচিহ্নকে অপ্রয়োজনীয় করে দেয়ার প্রবণতা দেখা গেল । এই উদাহরণটি তারই প্রাথমিক সঙ্কেত ।

সংবাদ সাময়িকপত্রের প্রাথমিক পর্বে যতিচিহ্ন ব্যবহারের যে প্রবণতাকে নিহিতযতি বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে তার উদাহরণ, বিশ্লেষণ ও আলোচনাকে সূত্রাকারে উপস্থিত করা যায় ।

১। ছোট-ছোট সংবাদ-মন্তব্যে ও সামাজিক নকশায় গদ্যের সাবলীলতা ছিল । যতিচিহ্ন ব্যবহার না করার ফলে সেই সাবলীলতা ব্যাহত হয় নি । এই রচনাগুলির গদ্যে যতি নিহিত ছিল ।

২। রচনায় ব্যবহৃত প্রকাশ্য যতিচিহ্ন ও নিহিত যতিচিহ্নের মধ্যে বিরোধ ছিল ।

৩। সেই বিরোধের ফলে, ব্যবহৃত যতিচিহ্ন গদ্যের গড়ন ও ন্যাসের সঙ্গে গ্রথিত হতে পারে নি — যতিচিহ্ন যেন ছিল গদ্যের বাইরের একটি উপকরণ ।

৪। সেই কারণে রচনার প্রসঙ্গ, অনুপ্রসঙ্গ ও প্রসঙ্গান্তর বোঝাতে যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হতে পারছিল না। কিন্তু গদ্যের ভেতর নিহিত যতি গদ্যের চলমানতা একটা সীমা পর্যন্ত রক্ষা করতে পেরেছে ।

৫। বিষয়ের সঙ্গে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির অনৈক্যের ফলে ও দৃষ্টিভঙ্গির নিজস্ব অসঙ্গতির ফলে গদ্য হয়ে উঠতে পারছিল না লেখকের ব্যক্তিত্বের বাহন । তাই যতিচিহ্নও লেখকের ব্যক্তিত্বের ওতপ্রোত স্টাইলের অপরিহার্য উপকরণ হয়ে ওঠে নি ।

উপহিত যতি

পাঁচ

গদ্যচর্চার বিষয় ও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির অনৈক্য আর অসাম্যের মূল প্রোথিত আছে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালির সমাজপরিবেশেই । সামাজিক সংস্কারের কর্মসূচি ও হিন্দুভারতীয় শাস্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে সমাজের একএকটি অংশের এক এক রকম মত ও সেই মতকে কেন্দ্র করে এক-একটি সংবাদ-সাময়িকপত্র — আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে গদ্যচর্চার পরিবেশকে এই রকম সূত্রের ছাঁচে সাধারণত বর্ণনা করা হয় । এই ছাঁচটি ঠিক নয় । সংস্কার কর্মসূচি ও শাস্ত্রব্যাখ্যা নিয়ে সমাজে একএকটা মতগোষ্ঠী হয়তো কিছুটা তৈরি হয়েছিল কিন্তু সেই মতগোষ্ঠীর সদস্যদের বাংলা গদ্য রচনার এমন কোনো ক্ষমতাই ছিল না যার ফলে মতগোষ্ঠী সাময়িকপত্রের গদ্যচর্চাকে প্রভাবিত করতে পারে । ফলে এক-একটি সংবাদ-সাময়িকপত্রের একএকজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন — তাঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জমিদার বা নায়েব-বেনিয়ান । পত্রিকার একজন সংগঠক-সম্পাদক ছিলেন - তিনি প্রধান লেখক হতে পারেন । তাঁর অধীনে বেতনভুক বেতনভুক একদল লেখক থাকতেন । পত্র-পত্রিকায় এরকম সংবাদ চোখে পড়ে যে কোনো পত্রিকার পন্ডিত অন্য পত্রিকায় যোগ দিচ্ছেন বা নিজে কোনো পত্রিকা প্রকাশ করেছেন । সমাজসংস্কারের কর্মসূচি বা শাস্ত্রব্যাখ্যা নিয়ে নানা মত গোষ্ঠীতে বিভক্ত নব্যশিক্ষিতরা নিজেদের বক্তব্য প্রমাণের জন্য কলম ধরেছেন — আর তাঁদের কলমে বাংলা গদ্যভাষা তৈরি

হয়ে যাচ্ছে — এমন অবস্থার পরিবর্তে অবস্থাটা ছিল, নানামতগোষ্ঠীতে বিভক্ত সমাজের ধনী ব্যক্তিরা নিজেদের বক্তব্য প্রচারের জন্য বা অন্য কোনো কারণে একএকটি সম্পাদককে টাকাপয়সা দিতেন, সম্পাদক পন্ডিতদের সহায়তায় পত্রিকা বের করতেন। এই কালপর্বে গদ্যচর্চার পৃষ্ঠপোষক, সম্পাদক ও লেখক — এই তিনটি স্তরের কোনো একটি স্তরও তাদের বক্তব্যপ্রতিপাদনের অপরিহার্য উপকরণ হিসেবে গদ্যকে গ্রহণ করতেই পারে নি। ফলে গদ্যের উপকরণগুলির নান্দনিক বিন্যাস ছিল সেই সমাজপরিবেশে সম্পূর্ণ অবান্তর। যতিবিন্যাস তো গদ্যের একটি প্রধান উপকরণ।

স্বর ও শ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করে, উচ্চারণের বৈচিত্র্যে, যতিচিহ্ন বাক্যের ভেতরে শব্দের সঙ্গে শব্দকে গেঁথে দেয়। আর বাক্যের শেষে স্বর ও শ্বাসের বিরতি ঘটিয়ে যতিচিহ্ন বাক্যকে মুক্ত করে দেয়। পদ্যে আরো অনেক কায়দাকানুনের সুযোগ আছে। কিন্তু গদ্যে, যতির এই বিপরীত চালেই ছন্দ স্পন্দিত হয়ে ওঠে। সেই ছন্দ-স্পন্দন অর্থের সঙ্গে অন্বিত ও শব্দের অক্ষর-সমাবেশের হ্রস্বদীর্ঘতার ওতপ্রোত। এটা গদ্যের স্বভাবপ্রবণতা। ব্যাকরণের দ্বারা সেই অন্বয় নির্দিষ্ট হয় না, নির্দিষ্ট হয় শ্রম আর উৎপাদনের জটিলতার সঙ্গে সামাজিক মানুষের অন্বয় সাধনের অভিজ্ঞতার নান্দনিক উত্তরণ দিয়ে। আর শব্দের উচ্চারণের বিশিষ্টতাও আসে না ব্যাকরণের নির্দেশে — আসে মানুষের জিভে জিভে পৌরাণিক স্মৃতিঘন শব্দমালার উচ্চারণের ব্যবহারে। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির একটি মূল আমাদের গদ্যভাষার প্রথম পর্বের সমকালীন সামাজিক শ্রম আর উৎপাদনকে বিযুক্ত নিষ্ক্রিয় করে দেয়। তাই গদ্যে শব্দের নতুন অন্বয় আর উচ্চারণের নতুন ধ্বনি খুঁজতে সংবাদসাময়িকপত্রে জনসংযোগের সাপ্তাহিক-পাক্ষিক-মাসিক দায় ঘোচাতে আমাদের যাওতই যেতে হয়, ইংরেজি গদ্যের কাছে, নয় তো সংস্কৃত ব্যাকরণের কাছে। আমাদের গদ্যভাষা তৈরি হল এমন এক ভাষার আদর্শে যা পরভাষা — স্থানগত কারণেই যার সঙ্গে আমাদের যোগ নেই, আর এমন এক ভাষার আশ্রয়ে যা মৃতভাষা — কালগত কারণেই যার সঙ্গে আমাদের যোগ নেই। সেই প্রাথমিকযুগে সংস্কৃতের আশ্রয়ে ইংরেজি আদর্শ অনুসরণের অন্তর্নিহিত সংঘাতের অনিবার্য পরিণামে, যতিচিহ্ন ব্যবহারের বিকল্প পথ হাতড়াবার প্রয়োজনে, বাংলা গদ্যকে, সংস্কৃতে বাক্যের অবিচ্ছিন্নতার রীতির অনুসরণে গদ্যে বিবরণের ধারাবাহিকতা, ঘটনার চলমানতা, শব্দের গড়নের নিটোলতাকে নষ্ট করতে হয়েছে।

বাংলা সাময়িকপত্রের প্রাথমিকপর্বে সংস্কৃত পন্ডিতগনই পত্রপত্রিকার বেতনভুক লেখক ছিলেন। বাংলাদেশের সংস্কৃত পান্ডিত্যের প্রধান ভিত্তি স্মৃতিশাস্ত্র ও নব্যন্যায়। তাই সাময়িকপত্রে গদ্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যতিচিহ্ন ব্যবহারের মতো গদ্যরীতির অপরিহার্য উপকরণ বিকশিত হয়ে না উঠে, সংস্কৃত রীতিপ্রয়োগের দ্বারা সেই ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাটুকু-ও যেন অস্বীকৃত হতে চায়। বাংলাগদ্যের প্রাথমিকপর্বের গড়নের ভেতরই যতিচিহ্নের বিকল্প সন্ধানের চেষ্টা সক্রিয় থাকায় বাংলায় সাময়িকপত্রের গদ্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার বিলম্বিত হতে থাকে। তার প্রভাব সাময়িকপত্রের গদ্যরীতির ওপরও পড়ে। যতিচিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন অথচ যতিচিহ্ন ব্যবহার না করে সেই প্রয়োজন নির্বাহের

531
Centre for Studies in Social Sciences Calcutta
LIBRARY.

চেষ্টায় বাংলার সাময়িকপত্রের গদ্যরীতি প্রাথমিকপর্বে, ১৮৩০ সাল নাগাদ, ক্রমেই সংস্কৃতনির্ভরতা দিকে বদলে যায়। এই সংস্কৃত নির্ভরতার অন্যান্য দিক ও কারণ আছে কিন্তু যতিচিহ্নের অভাব বাক্যের গড়ন দিয়ে মেটানোর চেষ্টাও তার একটি কারণ। প্রথমে দুটি উদাহরণ দিয়ে প্রবণতাটি ব্যাখ্যার চেষ্টা করা যায়।

উ. ১ <u>১০ জুন ১৮২১, বঙ্গদূত</u>

> গৌড়দেশের শ্রীবৃদ্ধি ॥ গত কএক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ও গৌড়রাজ্যের সর্ব্বত্র অনেক ধনবৃদ্ধি হইয়াছে ইহার কোন সন্দেহ নাই <u>অতএব</u> কি কারণে বৃদ্ধি হয় তাহার অনুসন্ধান আমারদিগের <u>সুতরাং</u> আবশ্যক, <u>অতএব</u> লিখিতেছি এই দেশের পূর্ব্বাপেক্ষা যে এক্ষণে অবস্থান্তর হইয়াছে ইহার কারণ এই যে পূর্ব্বাপেক্ষা ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, দ্বিতীয়ত: এদেশে অবাধে বাণিজ্য ব্যবসায় চলিতেছে, বিশেষত: অনেক য়োরোপীয় মহাশয়েরদিগের সমাগম হইয়াছে, <u>অতএব</u> এই ত্রিবিধ কারণকে দৃষ্টীভূত করণার্থে নানাপ্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে <u>কিন্তু</u> <u>যেহেতু</u> ঐ সকল কারণ সহজেই প্রত্যক্ষ <u>অতএব</u> তাহার ভূমিকার অপেক্ষা নাই <u>যেহেতুক</u> প্রত্যক্ষে কিং প্রমাণং। পূর্ব্ব ত্রিশ বৎসর যে-সকল ভূমি ১৫ পোনের টাকা মূল্যে ক্রীতা হইয়াছিল এক্ষণে তিনশ টাকা পর্য্যন্ত তাহার মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে এবং এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দৃষ্ট, এমতে ভূম্যাদির মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা সম্পদ হওয়াতে জনপদের পদবৃদ্ধি হইয়াছে যে সকল লোক পূর্ব্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষনে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দিন দীনের দীর্ঘতা হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহারদিগের বাহ্য দিন প্রকাশ পাইতেছে। [স. সে. ক. ১, পৃ ৩৫২]।

প্রথম দাঁড়ির দ্বারা প্যারাটি যে-দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে তার প্রত্যেকটি ভাগকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে প্রথমাংশে একটি বাক্য থেকে আর একটি বাক্য যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে, বাক্যগুলি যাতে অত্যন্ত দৃঢ় বন্ধনে বাঁধা থাকে ও গদ্যের ন্যায় (logic) যাতে অস্পষ্ট থাকে সেই কারণে লেখক ৪ বার 'অতএব', ২ বার 'যেহেতুক', ১ বার 'সুতরাং' ও ১ 'কিন্তু' ব্যবহার করেছেন —— ব্যাকরণের দিকদিয়ে 'সুতরাং'-টি একেবারেই না চললেও। আ… পাঠে এই সংযোজক পদগুলির জায়গায় শুধু যতিচিহ্নই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অভিপ্রেত। যদি এই সংযোজক-পদ না থাকত তাহলে বলা যেত যতিচিহ্নগুলি ব্যবহৃত না হলেও নিহিত আছে। কিন্তু যতিচিহ্নের সংযোজক-পদ ব্যবহারের ফলে সম্পূর্ণ বাক্যের গড়নটি বদলে গিয়ে একটা তথাকথিত নৈয়ায়িক গড়ন নিল। হেত্বর্থক সংযোজক-পদ দিয়ে বাক্য-শৃঙ্খলা রক্ষা করার এই রীতি এসেছে বাঙলাদেশের স্মৃতিশাস্ত্রীয় নব্যনৈয়ায়িক ধারার অনুসরণে।

উ ১০। ১৪ ডিসেম্বর, ১৮৩৩ সমাচার দর্পণ

মহামহিমবর শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। আমরা কএকজন বঙ্গদেশীয় এক বিষয়ে অপমান ও আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া আপনাকে জানাইতেছি যে হিন্দুস্থানে বাঙ্গালিদিগের প্রধান কর্ম্মাদি প্রাপণে তদ্দেশস্থ লোকে কহে যে পূর্ব্বসর বোর্ডের সাহেবদিগের নিষেধ আছে এবং উক্ত কথাও সত্য বোধ হইতেছে যেহেতুক সাহেবলোক প্রায় বাঙ্গালিদিগকে প্রধান কর্ম্ম দেন না [।।] যাঁহারদিগের দেওনে ইচ্ছাও আছে তিনিও সক্ষম হন না কারণ আপন আপন এলাকার কমিস্যনর সাহেব মঞ্জুর করেন না কিন্তু শত২ হিন্দুস্থানি লোক বাঙ্গলা ভাষায় ও অক্ষরে অনভিজ্ঞ থাকাতেও অস্মদ্দেশে নানাস্থানে প্রধান২ কর্ম্ম করিতেন [।।] বাঙ্গালিগণের কি দুর্ভাগ্য যখন ১৮৩১ সালের কানুন পঞ্চম জারী হয় তখন বোধ হইয়াছিল যে অনেক বাঙ্গালি সদর: সদুর হইবেক তাহাও হইল না এবং ইঙ্গরেজীতে পারগ যে বাঙ্গালি কোন সরকারী আফীসে কর্ম্ম খালি হইলে তচ্চেষ্টা করিলে যদিস্যাৎ তৎসময়ে কেন একা ফিরিঙ্গি উপস্থিত হয় তবে ঐ খ্রীষ্টীয়ান ফিরিঙ্গিতে কর্ম্ম পায় যাহা হউক রাজা ও ঈশ্বর প্রায় তুল্য এবং সর্ব্বজীবে সমভাব তবে হিন্দুস্থানে আমারদিগকে কি কারণে এমত অসহিষ্ণু অপমান করেন যদি বলেন যে গভর্ণমেন্ট এমত হুকুম কদাচ দেন নাই তবে অকারণে আমারদিগের প্রতি এমত অন্যায় আচরণ কেন হয় যদ্যপি কহেন যে পূর্ব্বকার বোর্ডের সাহেবেরা হুকুম দিয়া গিয়াছেন সেই হুকুমানুসারে উচ্চপদস্থ সাহেবলোক বাঙ্গালিদিগকে প্রধান কর্ম্ম দেন না উত্তর ঐ বোর্ডের সাহেবলোকের সমীপে যদি কোন বাঙ্গালি কুকর্ম্ম করিয়া থাকে কিম্বা তৎকালীন পারস্যভাষাতে অপারগ জানিয়া অথবা অন্যকারণবশত: হুকুম দিয়া থাকেন এ হালতে এক ব্যক্তি তদধিক ব্যক্তিদিগের অপরাধে দেশের তাবৎলোক দোষী হইতে পারে না। [।।] ইহা হইলে কোন জাতীয় লোক ব্রিটিস গভর্ণমেন্টের কর্ম্ম পাইতে পারেন না আপনি কৃপাবলোকনপূর্ব্বক এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিয়া গভর্ণমেন্টের অনুমত্যনুসারে সর্ব্বসাধারণ গেজেট অর্থাৎ গবর্ণমেন্ট গেজেট ও ইন্ডিয়া হরকরা প্রভৃতি সংবাদপত্রে ছাপাইয়া দেন যে হিন্দুস্থানে বাঙ্গালি কি অন্যান্য জাতির কোন কর্ম্ম পাইতে নিষেধ নাই [-] ইহা হইলে আমরা সর্ব্বতোভাবে আপনার নিকট পরমোপকৃত আছি ও হই এবং বাঙ্গালিগণ যে এ বিষয়ে আত্যন্তিক ম্লান আছেন তাহাও আপনার দয়াপ্রকাশে প্রফুল্ল হন নিবেদন ইতি সন ১২৪০ সাল তারিখ ২৫ অগ্রহায়ণ। শ্রীকমলাপ্রসাদ রায়। শ্রীহরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শ্রীচন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায়। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মোং কলিকাতা। [স. সে. ২ পৃ ৪৬০]

সরকারি বড় চাকরিতে বাঙালিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা চিঠি লিখছেন, ধরেই নিতে হয় তাঁরা শিক্ষাদীক্ষায় সমাজে বেশ অগ্রসর ও প্রতিষ্ঠিত। এ-চিঠিটিকে সংবাদ-

সাময়িকপত্রের গদ্যের উদাহরণ হিসেবে যেমন তেমনি তখনকার বাঙালি এলিটদের একটা অংশের গদ্যচর্চার নমুনা হিসেবেও গ্রহণ করা যেত কিন্তু চিঠিটির একেবারে শেষে 'পরমোপকৃত আছি ও হই' 'আত্যন্তিক ম্লান আছেন' 'আপনার দয়াপ্রকাশে প্রফুল্ল হন'— এই অংশগুলি দেখে অনুমান হয় চিঠিটি ইংরেজিতে লেখা হয়েছিল, এটি তার বাংলা অনুবাদ।

এত বড় একটি চিঠিতে দাঁড়িচিহ্ন একবারও ব্যবহৃত হয় নি — একমাত্র চিঠিটির শেষে ছাড়া। যে, যখন, যাহারদিগের ইত্যাদি সাপেক্ষ সর্বনাম বা কেননা, কারণ ইত্যাদি হেতুবাচক শব্দ ও যদি, তবে ইত্যাদি অব্যয় — প্রয়োগে (২১ বার) তাই বাক্যগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে নৈয়ায়িক শৃঙ্খলে বাঁধা হয়েছে। এই শব্দগুলি নিহিত যতিকে যেমন বাতিল করে, তেমনি, স্পষ্ট যতিব্যবহারের অবকাশও রুদ্ধ করে। মাত্র ৪ টি জায়গা এমন আছে যেখানে উপস্থিতযতি ব্যবহৃত হয় নি, নিহিত যতির সুযোগ আছে, কিন্তু সে সুযোগেও বাক্যের গড়নের জন্য স্পষ্ট হতে পারে নি। তার ভেতর শেষ দুটি জায়গা 'ইহা হইলে' এই শর্ত-সমন্বিত বাক্যাংশের ব্যবহারের ফলে পরবর্তী বাক্যের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে যায়। প্রথম জায়গাটিতে 'কেননা সাহেব লোক প্রায় বাঙ্গালিদিগকে প্রধান কর্ম্ম দেন না' এরপর লেখা হচ্ছে, 'যাঁহারদিগের দেওনে ইচ্ছাও আছে তিনিও সক্ষম হন না'। ফলে এই বাক্যাংশটিকেও পূর্ববর্তী বাক্যের 'কেননা'-র সঙ্গে অন্বিত করা যায়। সুতরাং বাক্যগঠনের বিচারে এই রচনাটিতে একমাত্র দ্বিতীয় জায়গাটিতে 'বাঙ্গালিগণের কি দুর্ভাগ্য' এই বিস্ময় বাক্যের আগে দাঁড়ি দেয়ার যথাযথ অবকাশ আছে। কিন্তু এই দাঁড়ি ব্যবহারের পেছনে একটি বাক্যের ও প্রসঙ্গের অবসান যতটা সক্রিয় হতে পারে তার চাইতে অনেক বেশি সক্রিয় পরবর্তী বাক্যের 'বাঙ্গালিগণের কি দুর্ভাগ্য' গঠনের এই নতুনত্ব। অথচ বাক্যগঠনের এই আলঙ্কারিক ভঙ্গি সম্পর্কে এই আংশিক সচেতনতা যতিব্যবহারে বা অন্যান্য বাক্যগঠনে লক্ষ করা যায় না।

সামাজিক বিষয়ই যেহেতু সংবাদসাময়িকপত্রের গদ্যচর্চার প্রধান অবলম্বন ছিল, তাই, গদ্যচর্চার শাস্ত্রীয় (academic) আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিষয়ের চাপও গদ্যচর্চাকে নিয়ন্ত্রিত করছিল। ফলে, গদ্যের গড়নেও এই দুই দিক থেকে দুই ধরণের প্রভাব পড়ছিল। যেমন সংস্কৃত রচনারীতির অনুসরণে যতিচিহ্নকেই অপ্রয়োজনীয় করে দেয়া হচ্ছিল, তেমনি আবার কোনো কোনো সামাজিক বিষয়ের সঙ্গে লেখকের একধরণের ঐক্যস্থাপনের চেষ্টাও চলছিল। সেই চেষ্টার ফলে দেখা যায় সংযোজক পদ দ্বারা বাক্যের সঙ্গে বাক্যের বন্ধন ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে আবার লেখকের বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিষয়কে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গে ভাগ করার চেষ্টা চলে। এমন-কি একটি প্রসঙ্গের ভেতরও যুক্তিপরম্পরার শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলে।

যতিচিহ্ন ব্যবহারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য এই প্রসঙ্গ ও অনুপ্রসঙ্গ নির্দেশ। রচনার প্যারাভাগ বা দাঁড়িচিহ্ন দিয়ে বোঝা যায় লেখক কীভাবে তাঁর বিষয়ের প্রসঙ্গ ও অনুপ্রসঙ্গকে নির্দিষ্ট করতে চান। এই ভাগ বিষয় উপস্থাপন সম্পর্কে লেখকের শৈলী সচেতনতার ফল যেমন হতে পারে বিষয়ের সামাজিক তাৎপর্যের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিত্বের যোগবিয়োগের ফল।

১৮৩০-এর দশকে যখন সমাজসংস্কারের নানা বিষয় নিয়ে বাঙালিসমাজ নানামতগোষ্ঠীতে স্পষ্ট বিভক্ত ও ইংরেজি শিক্ষিত যুবকরা সরকারি কর্মপ্রার্থী — তখনই সংস্কৃতব্যাকরণসম্মত গদ্য-রচনারীতি অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে আবার গদ্যের যুক্তিপরম্পরাপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাও চলে। এই দুই চেষ্টার ভেতর বিরোধিতা ছিল। যতিচিহ্ন না দেয়া আর প্রসঙ্গ ও যুক্তিপরম্পরা নির্দেশের এই বিরোধিতা গদ্যশৈলীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। হিন্দুসমাজের কৌলীন্য প্রথা, ইংরেজি শিক্ষিতদের জন্য সরকারি চাকরি ও খ্রিস্টান আর হিন্দুধর্ম — এই তিনটি সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত তিনটি বিশিষ্ট রচনার উদাহরণ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

উ ১১। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ সমাচার দর্পণ

... কুলীন মহাশয়দিগের দৌরাত্ম্যপ্রযুক্ত যোত্রহীন শ্রোত্রিয় অথবা বংশজ ব্রাহ্মনদিগের বিবাহ হওয়া অতি দুঃসাধ্য হইয়াছে যেহেতুক অর্থব্যয় ভিন্ন তৎকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া উঠে না সুতরাং যাঁহারা যোত্রহীন তাঁহারদিগের বিবাহ হওয়া ভার [।] বস্তুত যোত্রহীন শ্রোত্রিয় এবং বংশজ ব্রাহ্মন বৃদ্ধাবস্থা-পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছেন এবং এইক্ষণেও অনেকে ৩০।৪০।৫০ বা ততোধিক বৎসর বয়স্ক হইয়া অবিবাহ রূপে লোকে জরজর ঘরঘর এবং ঘরঘর হইয়া রহিয়াছেন তাঁহারদিগের এ কাটামোতো আইবুড় নাম ঘুচে কিনা বলা যায় না। . . . উক্ত কুলীনপ্রাধান্য এতদ্দেশীয়দিগের নির্ধন হওনের এক বলবৎ কারণ যদিস্যাৎ তাঁহারদিগের ধননাশের প্রতি অন্যান্যএক কারণ আছে কিন্তু তন্মধ্যে ইহা যে এক প্রধান কারণ ইহা অবশ্য বলিতে হইবেক বিশেষতঃ যাঁহারদিগের কুলমর্য্যাদা আছে তাঁহারা বা তাঁহারদিগের সন্তানেরা অন্যান্য ন্যায় বিদ্যাভ্যাস করণে উৎসাহিত হন না কারণ তাঁহারা জানেন যে কোন শ্রোত্রিয় বা বংশজ ব্রাহ্মনেরা নানাগুণে গুনবান হইলেও জাত্যংশ বিষয়ে তাঁহারদিগের তুল্য স্থান কদাচ হইতে পারিবেন না অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তিরা অর্থব্যয় ব্যতিরেকে বিবাহ করিতে সমর্থ হইতে পারিবে না এবং আপন২ দারাদি ভরণপোষণের ভার হইতে ও তাঁহারদিগের ন্যায় মুক্ত হস্ত হইতে পারিবেন না। যদিস্যাৎ কুলীন ব্রাহ্মনদিগের মধ্যে বা তাঁহারদিগের সন্তানদিগের মধ্যে কেহ২ এইক্ষণে কিঞ্চিৎ২ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন বা করিতেছেন কিন্তু তাঁহারদিগের সেরূপ বিদ্যাভ্যাসে দেশের কুশল নাই যেহেতুক তাঁহারা বয়স্থ হইলে আপন২ কুলমর্য্যাদাকে এক লাভজনক ব্যাপার জ্ঞান করিয়া তাহার পৈতৃক ধারাবাহী হইয়া অহঙ্কৃত হয়েন এবং অহঙ্কারের যে দোষ তাহা কিঞ্চ মহাশয়দিগের অগোচর কি আছে যাহা হউক নবগুণ বিশিষ্টত্ব কুলীন অর্থাৎ আচারো বিনয়োবিদ্যা ইত্যাদি নবগুণ কৌলীন্যের প্রসিদ্ধ লক্ষণ কিন্তু এইক্ষণে যে২ মহাশয়দিগকে কুলীন বলিয়া মান্য করা যায়

তন্মধ্যে অনেকে উক্ত নবগুণবর্জ্জিত বরং তাঁহারদিগকে নির্গুণচূড়ামণি বলা যাইতে পারে [।] কোন২ স্থানে এমত ঘটিয়াছে যে কোন২ কুলীন জামাতা আপন২ শ্বশুর প্রভৃতির প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া রাত্রিযানে রাগভরে আপন২ পত্নীর সহ শয়নে থাকিয়া সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে আপন নিদ্রিত পত্নীর গাত্রের সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্যাদির আভরণ এবং পরিধেয় বস্ত্র অতি সাবধান পূর্ব্বক খুলিয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছেন এবং আরো শুনা এবং দেখা গিয়াছে যে কোন কোন কুলীন মহাশয়েরা রাগস্থলে আপন শ্বশুরের বাটী হইতে স্বং পত্নীকে আপন২ গৃহে আনয়নপূর্ব্বক ঐং কন্যার পিতৃদত্ত স্বর্ণভরণাদি সমস্ত কাড়িয়া লইয়া তাহা বিক্রয় করিয়া আপনারা মজা মারিয়াছেন এবং উক্ত কন্যারদিগকে নানামতে ক্লেশ দিয়াছেন [।] পরে ঐ অভাগা কন্যারদিগের পিতৃ মাতৃ অথবা ভ্রাতৃ প্রভৃতিরা ঐ কন্যার খড়ে প্রাণ থাকিতে২ তত্ত্বৎসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত সময়ে উক্ত কুলীন মহাশয়দিগকে অর্থ দান দ্বারা এবং নানাস্তব বিনয় দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া চিকিৎসাদি দ্বারা উক্ত কন্যারদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন কিন্তু যেস্থলে উপযুক্ত সময়ে উক্ত কুলীন পাত্রস্থা কন্যাসন্তানাদিগের তত্ত্বধারণ তৎৎ পিতৃ বা ভ্রাতৃপ্রভৃতিদ্বারা না হয় সে স্থলে ঐ অভাগা কন্যা সন্তানাদির জীবনাবসানহওনের প্রতি কোন সন্দেহ থাকে না যেহেতুক কুলীন মহাশয়েরা আপন২ স্ত্রী-পুত্রদিগের প্রতিপালন করাকে এমত কুকর্ম্ম জানেন যে তাঁহারদিগের পীড়িতাবস্থাতেও তাঁহারদিগের চিকিৎসা বিষয়ে কোন চেষ্টা করেন না না এবং এতদ্রূপ চেষ্টাকে আপন২ কৌলীন্যের হানিকারক জানেন ... । [স. সে. ক. ২ । পৃ ১৭৭] ।

মূল রচনার দুটি জায়গা বাদ দিয়ে অংশটি উদ্ধৃত হয়েছে । সেই অনুদ্ধৃত দুটি জায়গার দুটি দাঁড়িকে হিসেবে নিলে দীর্ঘ রচনাটিতে দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র ৫ বার — তার ভেতর ১ বার রচনার শেষে । উদ্ধৃতিটির আভ্যন্তরীণ দাঁড়ি দেয়ার জায়গা দুটো বিচার করলে দেখা যায় একএকটি প্রসঙ্গের শেষেই দাঁড়িটি ব্যবহৃত হচ্ছে । অর্থাৎ দাঁড়ি দেওয়ার জায়গা বাছাই- এর ভেতর একটা পদ্ধতি আছে — সেই প্রসঙ্গান্তর নির্দেশ যতই সংকীর্ণ হোক না কেন । যে-সে, যে-তাহা, যাহারদিগের-তাহার দিগের, যেহেতুক - সেহেতুক ইত্যাদি সাপেক্ষ সর্বনাম ও সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করে একটি বাক্যের সঙ্গে তার পরবর্তী বাক্যকে গ্রথিত রাখা হয়েছে । আধুনিক বিচারে তৎসত্ত্বেও হয়তো ত্রিয়াকে অনুসরণ করে দাঁড়িচিহ্ন দেয়া চলে — কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে সাপেক্ষ সর্বনামগুলি বাদ দিলে বাকি সংযোজক অব্যয় বা পদগুলির পরিবর্তে দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন বা ড্যাশ অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ব্যবহৃত হতে পারে । সংযোজক পদ অথচ কোনো যতিচিহ্নও ব্যবহৃত হয় নি এমন ফাঁক জায়গা আছে মাত্র ৩ টি । এই জায়গাগুলিতে আমরা একটি করে দাঁড়ি হয়ত বসাতে পারি, তাছাড়া কোথাও যতিব্যবহারের কোনো সুযোগই নেই । উদ্ধৃতিটিতে ব্যবহৃত ৩১টি

সংযোজক পদের ভেতর ২৯টি ব্যবহৃত হয়েছে বাক্যের সঙ্গে বাক্যের গ্রন্থনে, বাকি মাত্র ১০টি ব্যবহৃত হয়েছে দুটি শব্দের ভেতর ।

উ ১২ । ২ মে ১৮৩১ সমাচার চন্দ্রিকা

হিন্দু হইয়া ইংরাজী বিদ্যায় বিদ্বান হইলে নাস্তিক হয় ইহা পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিলাম না কেননা পূর্ব্বে যে সকল দেওয়ান মুৎসদ্দি লোক ছিলেন তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস করিয়া সাহেবলোকের অভিপ্রায় মত কর্ম্ম সুসম্পূর্ণ পূর্ব্বক বহু ধনোপার্জন করিয়াছিলেন [।] ইহাতে ইংরাজেরা তুষ্ট হইয়া তাঁহারদিগকে নানাপ্রকারে মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন [।] যদি বল তখনকার মুৎসুদ্দি মহাশয়রা ভাল ইংরাজী জানিতেন না কেননা কথিত আছে ঢেকি যন্ত্রের বিবরণ কোন মুৎসুদ্দি ইংরাজী ভাষায় তরজমা করিয়াছিলেন টুমেন থাপুড় ধুপুড় ওয়ান ম্যান সেঁকে দেয় ইহা হইতে পারে [।] ইংরাজেরদিগের প্রথমাধিকার সময়ে তদ্ভাষায় বহুতর লোকে সুশিক্ষিত হইতে পারেন নাই কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে তাঁহারা ক্ষমতাপন্ন লোক ছিলেন এবং কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন । . . .

. . . এক্ষণে যাহারা ভাল ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছে তাহারদিগের বিদ্যার কি এই ফল হইল কেবল নাস্তিকতা করিবেক ভাল যদি ঐ নাস্তিকের মধ্যে উক্ত ব্যক্তিদিগের মত কেহ পদপ্রাপ্ত হইতে পারিত তথাচ বুঝিতাম যে নাস্তিকতা করাতে সাহেব লোক তুষ্ট আছেন এই নিমিত্ত করে [।] তাহা কোনমতেই নহে কেন না কর্ম্মকর্ত্তা সাহেব লোক বৈদিক নাস্তিককে কখন উচ্চপদে বা বিশ্বস্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করে না ইহা নিশ্চয় আছে যেহেতু যেব্যক্তি আপন ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে তাহা হইতে কোন কুকর্ম্ম না হয় [।] সে অবশ্যই বিশ্বাসের অপাত্র ইহা কি তাঁহারা জানেন না তৎপ্রমাণ যে সকল বালক ভাল ইংরাজী জানে তাহারা কেহ কোন পাঠশালার টিচর কেহ বা ১৬ টাকার কেরাণি কেহবা অভিমানী ঘরে বসিয়া আছে কেবল পারিতোষিক যে পুস্তকগুলিন পাইয়াছিল তাহাই পাঠ করে হিন্দুর দ্বারে অর্থাৎ কোন প্রধান লোকের নিকট যাইতে পারে না গেলেই নাস্তিকতা দোষের সমুচিত ফল পাইবেক সে ভয় আছে ঐ সকল অভাগারা ইহা কি কিছুমাত্র বিবেচনা করে না — [স- সে- ক. ২, পৃ ৪৭৬ - ৪৭৭]

অংশটিতে মাত্র ১টি জায়গায় দাঁড়ি দেয়া হয়েছে । সম্পূর্ণ রচনায় এই দাঁড়িতে প্যারাটি শেষ হয় নি, প্যারার মাঝখানে এই দাঁড়ি পড়েছে । রচনাটিতে মোট ৭টি প্যারা আছে । প্যারা-ভাগের মধ্যে একটি পদ্ধতি আছে । ১ম প্যারায় ইংরেজি শিক্ষিত অথচ আস্তিক হিন্দুদের তালিকা । ২য় প্যারায় ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক নাস্তিকদের অবস্থা (উদ্ধৃত) । ৩য় প্যারায় ইংরেজি শিক্ষা ও নাস্তিকতার ভেতর কোনো সম্পর্ক নেই এ বিষয়ে মন্তব্য । ৪র্থ প্যারায় পাঠকদের উদ্দেশ্যে তিন

লাইন। দু লাইনের ৫ম প্যারায় সমাচারদর্পণ - সম্পাদকের মন্তব্য। ৬ষ্ঠ প্যারায় (৫ লাইন) তার উত্তর ৭ম প্যারায় (৩ লাইন) পাদ্রোক্তি দিয়ে রচনা শেষ। কোনো কৃত্রিম ধাঁচে প্যারাভাগ না করে লেখক রচনার প্রসঙ্গান্তরকে যথাযথভাবে নির্দিষ্ট করেছেন।

রচনার সামগ্রিক প্রসঙ্গান্তর বাছাইয়ে লেখক এতটাই নির্দিষ্ট অথচ প্যারার ভেতরের প্রসঙ্গান্তর তিনি নির্দেশ করেন না। নির্দেশ না করা সত্ত্বেও উদ্ধৃত অংশটিতে প্যারার ভেতরের প্রসঙ্গান্তর পাঠক সহজেই ধরতে পারেন। তার কারণ এই রচনার গদ্যভঙ্গিতে কোথাও কোথাও স্পষ্টভাবে, কোথাও অস্পষ্ট ভাবে কন্ঠস্বরেরঅনুসরণ আছে —

১। যদি বল ... তাহা হইতে পারে (১ম প্যারা)

২। তাহারদিগের বিদ্যার কি এই ফল হইল ভাল (২য় প্যারা)

৩। ঐ সকল অভাগারা ইহা কি কিছুমাত্র বিবেচনা করে না (২য় প্যারা)

গদ্যের স্টাইলে কন্ঠস্বরের এই ভঙ্গি এত সহজেই আসছে, অথচ লেখক যে ১৪টি সংযোজক শব্দ সবমিলিয়ে ব্যবহার করেছেন তার ১৪ টাই ব্যবহৃত হয়েছে বাক্যগুলিকে যুক্তকরার জন্য। এই সংযোজক পদগুলির ভেতর কোনো কোনো শব্দ যদি ব্যবহার না করা যেত, তাহলে সেখানে নিহিত যতি কার্যকর হত। সে-অবকাশ না রেখে লেখক সেখানে সংযোজক পদ ব্যবহার করেছেন। এই অংশটিতে সংযোজক পদ ও সাপেক্ষ সর্বনামের ব্যবহার ভিন্ন। তদুপরি কন্ঠভঙ্গির অনুসরণ আছে। ফলে হয়তো এর আগের উদাহরণটির মতো এই উদাহরণটি অতটা অনড় নয়, খানিকটা চলমানতা আছে। কিন্তু প্যারাভাগ, কন্ঠস্বর-অনুসরণের সাফল্য সত্ত্বেও বাক্যের অন্তর্গত যতিবিন্যাসের বেলায় সংস্কৃত নৈয়ায়িকতার শৃঙখলা লেখককে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে দেয় না।

উ ১৩। <u>১১ নভেম্বর ১৮৩১ সমাচার দর্পণ</u>।-

প্রভাকর সম্পাদক কর্তৃক এতদ্দেশীয় লোকেরদের তারদ্বিষয়ক সপ্তাহীয় রচনা।-
... শ্রীযুত ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্তি মহাশয়ের চটেগেঁয়ে যে অপহারক যেং বাবু কৃষ্ণ। ফ্রিঙগ হিন্দুইউথ নামক একখানি ক্ষুদ্র দর্গার পুষ্য পুস্ত্র পত্র প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে পেটকো ফিরিঙ্গি কৃষ্ণ। মুচি হিন্দুদিগের কি করিবেন [?] <u>যেহেতু</u> তাঁহার দক্ষিণহস্ত ইনকোয়েরর পত্রেই বা এ পর্য্যন্ত কি করিলেন <u>যে</u> এক্ষণে ঐ বাচ্ছা পত্র আচ্ছা হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের হানি করিবেক [।] ভাল ২ [,] বন্দা জেনো [যেন] তাহার সাধ্যমতে কসুর করে না [,] কিন্তু আমারদিগের বোধ হইতেছে <u>যে</u> ঐ বাচ্ছাপত্র বন্দ বাপার অভিমতে সৃজন হয় নাই [।] এ হায়াহীন ভ্রজো ভায়ার কর্ম্ম [।]

কেননা ভ্রজো ভায়া ইষ্টইন্ডিয়ান ও ইনকোম্পেরর পত্রদ্বারা কিছু করিতে না পারিয়া এক নেংটে ইঁদুর বাহাদুরকে প্রেরণ করিয়াছেন [,] যেমন মহী রাবণের বেটা অহিরাবণ [।] কিন্তু হে ফিরিঙ্গ সাহেব ভ্রজো ভায়া [,] তুমি হাজার প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া দর্গার নামে ভাল ঠুকিয়া দলবল সঙ্গে করে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে এসো কিন্তু মালামেন বাঙ্গালিদিগের ফতে করিতে পারিবে না [।] অতএব হে ভায়া [,] সামাল২ [,] তোমার জাঁকজমকরূপ কুরুতি টুপি কেড়ে নিয়ে ফুরুতি ভেঙ্গে দিবে [,] যেহেতু এ দলেও প্রধান যোদ্ধা শ্রীযুত ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।- [স. সে. ক. ২ । পৃ ১১৪] ।

দাঁড়ির সংখ্যা - ১ (রচনার শেষে)

সম্ভাব্য দাঁড়ির বা দাঁড়িতুল্য চিহ্নের সংখ্যা — ৬

[এর ভেতর মাত্র ২টি জায়গা সংযোজক হীন ফাঁকা জায়গা]

সংযোজক পদ - ৯

শব্দের মধ্যে সংযোজন — X

বাক্যের মধ্যে সংযোজন - ৯

রচনা রীতির দিক থেকে এই অংশটিতে নানান নতুন উপকরণ আছে । অংশটির ভেতর বহু জায়গায় শব্দের দিশি অপকর্ষণ ঘটানো বা অপকৃষ্ট ব্যবহার ইচ্ছাকৃত করা হয়েছে —— চটগেঁয়ে, পেটকো, বাচ্ছা পত্র, বন্দা, ক্ষুর, ঝয়া, ব্যাটা, নেংটে ইঁদুর, তাল ঠুকিয়া, ফতেবরা, ফুরতিভাঙ্গা । কয়েকটি জায়গাতে কন্ঠস্বরের অনুসরণ বাক্‌রীতিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে — হিন্দুদিগের কি করিবেন, ভাল২ বন্দা জেনো [যেন] . . ., ভ্রজো ভায়ার কর্ম্ম । বিষয়ের সঙ্গে লেখক এমনি জড়িয়ে পড়েছেন যে এই কন্ঠভঙ্গি ও শব্দের অপকর্ষণ এসে গেছে, ঘটে গেছে — এতটাই যে, শেষ দিকে লেখক চলিত ক্রিয়াপদ পর্যন্ত ব্যবহার করে ফেলেছেন — এসো, কেড়ে নিয়ে ।

যতিচিহ্নহীন টানা গদ্যের সঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যগুলি মিশতে পারে না বলে এই অংশটি পড়লে মানে বোঝা খুব কষ্টকর ঠেকে । মানে পরিষ্কার করার জন্য আধুনিক রীতিতে প্যারাটিকে যতিচিহ্নিত করে অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে- ৬টি জায়গায় পূর্ণযতির কোনো চিহ্ন ব্যবহার করা সম্ভব তার ভেতর মাত্র ২-টি জায়গা (দ্বিতীয় ও তৃতীয় দাঁড়ি) ব্যতীত বাকি ৪টি জায়গাতেই যথাক্রমে যেহেতু, কেননা, কিন্তু অতএব — এই চারটি হেতুবাচকপদ ও সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে ।অর্থাৎ এই ৪টি জায়গাতে লেখক যতিচিহ্নের বিকল্প হিসেবে উপহিতযতি ব্যবহার করেছেন । গদ্যের স্বাভাবিক যতিপ্রবণতাকে রুদ্ধ করার আর একটি প্রমাণ এই অংশে ব্যবহৃত মোট ৯টি সংযোজক পদই ব্যবহৃত হয়েছে বাক্যের সঙ্গে বাক্যকে গেঁথে দেয়ার কাজে ।

ফলে এই অংশটিতে সংস্কৃত রচনারীতির অবিচ্ছিন্ন বাক্য আর দেশি কথ্যরূপের ভেতরে
এক তীব্র শৈলীগত বিরোধিতা তৈরি হয়।

সংবাদসাময়িক পত্রের অনুসরণীয় ফর্ম আর সামাজিক বিষয় ও লেখকের ব্যক্তিত্বের
যোগবিয়োগের এই বিরোধিতার বিপরীত মেরুতে আছে আইন-আদালত, সরকারি বিজ্ঞাপন-
ইশতাহার ও শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি সংক্রান্ত রচনা। বাংলাগদ্যের বিকাশের ঐতিহাসিক পরিবেশে
ফর্ম আর ব্যক্তিত্বের বিরোধিতার সৃষ্টিশীল নিরসনের সম্ভাবনা যেমন ছিল না, আর সেই বিরোধিতার
ফলে যতিস্থাপনের মতো প্রয়োজনীয় উপাদান যেমন গদ্যের অপরিহার্য উপকরণ হিসেবে স্বীকৃত হতে
পারে না, তেমনি সরকারি আইন - ইশতাহার আর শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি সংক্রান্ত রচনায় গদ্যের
সেই জন্মকালেই বাংলা গদ্য এমন নিরপেক্ষতা, পরোক্ষতা ও স্পষ্টতা লাভ করে, যা প্রায় বিস্ময়কর।
নতুন ব্যাঙ্কব্যবস্থার শর্ত কণ্টকিত নিয়মাবলি বা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত সরকারি কোনো
নতুন আইন ধারা-উপধারা সহ বাংলায় অনূদিত বা লিখিত হয়েছে যতিচিহ্নিত বা যতিনিরপেক্ষ এমন
স্পষ্টতায় যা এই বিষয়গুলির আধুনিক সংস্করণেও বিরল। বাংলা গদ্যে বিষয় ও লেখকের বিরোধ
বা সংস্কৃতের আদর্শ আর ইংরেজি ছাঁচের বিরোধ এই বিষয়ক রচনার ক্ষেত্রে প্রায় যেন কোনো প্রতি
প্রভাবই ফেলে নি। বরং আইনের শর্ত সাপেক্ষতা অথচ প্রত্যক্ষতা আর স্পষ্টতার সঙ্গে বোধহয় সংস্কৃত
নৈয়ায়িক আদর্শের কোথাও মিলই ছিল। আর লেখকের সঙ্গে এই সব বিষয়ের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার
ফলে এইসব রচনায় এ ধরণের সাংবাদিক নিরপেক্ষতার অবকাশ ছিল।

এই সময়কাল জুড়েই (১৮১৮ - ১৮৫৮) আইন ও অর্থনীতি সংক্রান্ত রচনায় যতিচিহ্নের
ব্যবহার ও গদ্যশৈলী অনেক বেশি সুসংহত। তার একটি কারণ যেমন এই বিষয়গুলির বিশেষ ধরণের
নির্দিষ্টতা, তেমনি আর - একটি কারণ এই দুটি ব্যাপারের কোনোটিতেই বাঙালি সমাজের কোনো
সক্রিয় ভূমিকা ছিল না, দুটি ব্যাপারই বাঙালি সমাজের কাছে এসেছে তথ্য হিসেবে। যে-গদ্যের
প্রধান দায় শুধুই তথ্যবিবরণ দেয়া, সেই গদ্যের এক নিরপেক্ষ গড়ন থাকে। শিক্ষা ও সাহিত্যসহ
সামাজিক যে-কোনো ব্যাপারে বাঙালি সমাজের অংশ [illegible] অনেক বেশি প্রত্যক্ষ ভূমিকা লেখকের
লেখকের মাধ্যমে রচনায় যখনই প্রবেশ করে তখনই রচনার ভেতরে আবেগ, প্রাণের প্রবহমানতা,
কণ্ঠস্বরের অনুরণন সঞ্চারিত হয়। বাস্তবের সেই আবেগ, প্রবহমানতা ও বাক্‌স্পন্দ গদ্যকে নতুন গ
দেয়। বাংলাগদ্যের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ও ইংরেজি আদর্শের দ্বন্দ্ব এবং সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে বাংলা
গদ্যরচনার দায়িত্ব এমন এক কৃত্রিম গড়ন আগে থাকতেই তৈরি রাখে, যার সঙ্গে এই আবেগ, প্রবহ
মানতা ও বাক্‌স্পন্দের বিরোধ ঘটে। এই বিরোধের ফলে কিছুতেই সংবাদসাময়িকপত্রের গদ্যে
যতিচিহ্নের ব্যবহার নিয়মিত হতে পারে না। যতিচিহ্নের ব্যবহারে দীর্ঘ সময় ব্যাপী এই অনভ্যাস
ও অস্থিরতার পেছনে এই বিরোধ যে-কতটা সক্রিয় তার পরোক্ষ সাক্ষ্য —— শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি
ও আইন-আদালত সম্পর্কিত রচনায় যতিবিন্যস্ত গদ্যের গড়নের দৃঢ়তায়। সংবাদ-সাময়িকপত্রের

ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সমাজনিরপেক্ষ আবেগ-নিরপেক্ষ, নিঃস্পন্দ ও অনড় এই সব রচনায় যতিস্থাপন ও বাক্যগঠন ওতপ্রোত, যতি হয়ে ওঠে বাক্যের আবশ্যিক উপাদান, গদ্য স্থির, প্রসঙ্গ সুনির্দিষ্ট, যতিস্থাপনসহ গদ্যের অন্যান্য উপাদানে ব্যবহার সঙ্গতই — সবই একটু বেশি সঙ্গত, জীবনের চাইতেও একটু বেশি সম্পূর্ণ।

উ ১৪. ৩ এপ্রিল, ১৮১৯, সমাচার দর্পণ

শ্রীরামপুরের সঞ্চয়ার্থ ব্যাঙ্ক।

১ দফা। ১ মার্চ ১৮১৯ সালে সঞ্চিত টাকা নির্ভাবনাতে ন্যস্ত করিবার নিমিত্ত যে বাঙ্ক শ্রীরামপুরে স্থির হইয়াছে তাহাতে কোন ব্যক্তি রবিবার ব্যতিরিক্ত সপ্তাহের কোন দিনে এক টাকা পর্য্যন্ত রাখিতে পারে কিন্তু এক টাকার ন্যূন কিম্বা ভাঙ্গা টাকা রাখা যাইবে না।

২ দফা। এই বাঙ্কের মধ্যে যত টাকা ন্যস্ত হয় তাহার সুদ দেওয়া যাইবে। কোম্পানীর কাগজের ওপরে যে সুদ পাওয়া যায় তাহার কম সুদ দেওয়া যাইবে না। এবং শতকরা নয় টাকা হিসাবের বাড়া সুদ দেওয়া যাইবেক না কিন্তু বাজার ভাওতে সুদের কম বেশী প্রযুক্ত গত বৎসরের টাকার সুদ যে ভাও দেওয়া যাইবেক তাহা প্রতি বৎসর ৩০ এ ফরেলে প্রকাশ হইবেক।

৩ দফা। টাকা ন্যস্ত করিবার সময়ে কোন ব্যক্তি হইতে প্রিমিয়ম কিছু লওয়া যাইবেক না এবং যে ব্যক্তি কোন মাসের ১৫ তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে টাকা রাখে তাহার সুদ তাহার পর মাসের প্রথম তারিখ অবধি চলিবেক।

৪ দফা। যে টাকা এই ব্যাঙ্কে ন্যস্ত হয় সে টাকা কোম্পানির কাগজে রাখা যাইবেক কিম্বা বাঙ্গাল বাঙ্কেতে কিম্বা অন্য২ কুঠীতে রাখা যাইবে। যে ব্যক্তিরা এই বাঙ্কের অধ্যক্ষ আছেন তাঁহারা বাঙ্কে ন্যস্ত প্রত্যেক টাকার দায়িক। কিন্তু এই বাঙ্কের অধ্যক্ষ আছেন তাহারা বাঙ্কে ন্যস্ত টাকার দায়িক। কিন্তু এই বাঙ্কের এই অলংঘনীয় ব্যবস্থা যে এই বাঙ্কের ন্যস্ত টাকার মধ্যে এক টাকাও বাণিজ্যাদিতে নিয়োগ করা যাইবেক না।

৫ দফা । ইংগ্লন্ড দেশে এই মত বাঙেক যে বিষয় চেষ্টা এই বাঙেকরো সেই বিষয় চেষ্টা যে হিসাব এই মত সহজ হয় যে অত্যল্প কালে বাঙেকর হিসাব আদি করা যায় এই নিমিত্ত এই বাঙেক পূর্ণমাস ব্যতিরেকে ভাঙগা মাসের সুদ দেওয়া যাইবে না এবং বৎসরান্তে হিসাবের সময়ে আনা ও পাইর সুদ দেওয়া যাইবে না । এবং সুদ কষিলে পাই ধরা যাইবে না ।

দাঁড়ির সংখ্যা - (৫বার দফার ক্রমিক নম্বরে ও ৫ বার একএকটি দফার শেষে ৫বার প্যারার ভেতরে বাক্যের মধ্যে) ।

সম্ভাব্য দাঁড়ির সংখ্যা— X

সংযোজক পদ - ১১ (সবই বাক্যের মধ্যে)

উ ১৫. ৩ জানুয়ারি, ১৮২৪ সমাচার দর্পণ

সঞ্চয় ভান্ডার ।- সংপ্রতি শুনা গেল যে শহর কলিকাতার বড়বাজার নিবাসি শ্রীযুত গদাধর সেট ও রূপনারায়ণ বসাক ও বিজয়কৃষ্ণ সেট ও ভুবনমোহন বসাক ইহারা ঐক্য হইয়া সঞ্চয় ভান্ডার নামক এক কর্ম্মারম্ভ করিয়াছেন । তাহার স্থূল বিবরণ এই । এই সঞ্চয় ভান্ডারের ৬৪ অংশ হইয়াছে । ঐ অংশের টাকার সুদ হইতে কোম্পানির লাটরির টিকিট ক্রয় হইবেক । তাহাতে যে প্রাইজ পাওয়া যাইবেক তাহা চৌষট্টি অংশে বিভাগ হইয়া তাবৎ অংশিরা পাইবেন । ইহার বিশেষ ঐ ভান্ডারের জন্য যে আয়িন প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই জানা যাইতে পারে ।

ঐ আয়িন আমরা পাঠ করিয়াছি । তাহাতে ঐ সকল ব্যক্তিদিগের যে প্রকার বুদ্ধির প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে কাহার টিকিট ক্রয় বিষয়ে ক্ষতি হইতে পারে না এবং ইহাতে ধনের বৃদ্ধি হইতে পারে । অপর অত্যল্প অর্থাৎ পঞ্চাশ টাকা প্রথম দিয়া তাহাতে অংশী হইতে হয় পরে প্রতিমাসে দশ টাকা এমত চারিবৎসর কাল পর্য্যন্ত দিতে হইবেক । দেখ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার দশ টাকা দিতে কাহার কোন ক্লেশ বোধ হইবেক না কিন্তু লভ্য অধিকতর হওনের সম্ভাবনা আছে । না হইলেও আসলের ক্ষতি নাই এবং যদি আসল টাকা কেহ ফিরে চাহেন তাহাও তৎক্ষণাৎ পাইবেন অতএব এই সঞ্চয়ভান্ডার সৃজনকারি ব্যক্তিদিগকে আমরা ধন্যবাদ করিলাম ।

এক্ষণে মনে করি তাঁহারদিগের কৃত ঐ ভান্ডারের আয়িন লোকে দৃষ্টি করিলে অনেকে ঐ রীতিক্রমে অনেকপ্রকার নূতন নূতন কর্ম্ম আরম্ভ করিতে পারিবেন । । স. সে. ক. ১। পৃ ১৫০ ।

দাঁড়ির সংখ্যা — ৬

সম্ভাব্য দাঁড়ির সংখ্যা — ৬) শব্দের মধ্যে - ৪

সংযোজক শব্দ - ১৪ (বাক্যের মধ্যে - ১০

উ ১৬ । ২২ জানুয়ারি ১৮২৫ সমাচার দর্পণ :-

অত্যাবশ্যক ইশ্তেহার ।- ৮ জানুয়ারি তারিখে শ্রীশ্রীযুত গভর্ণর জেনেরাল বহাদর বোর্ড রিবিনুর দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে ১৮১৯ সালের ২৮ মে তারিখে কলিকাতার ভূমির রাজকর বিষয়ে শ্রীশ্রীযুতের যে আজ্ঞা প্রকাশ হইয়াছিল তাহা এক্ষণে রহিত হইল এবং তাহার পরিবর্ত্তে তদ্বিষয়ে এক্ষণে সই আজ্ঞা প্রকাশ হইল ।

যে কলিকাতানগরস্থ যে প্রজারা স্ব২ ভূমির নিরূপিত বার্ষিক রাজস্ব দিয়া থাকেন তাহারা সেই ভূমি এইরূপে কতক দিবসের কারণ নিষ্কর করিতে পারিবেন । যিনি সংপ্রতি একেবারে সাড়ে সাত বৎসরের রাজস্ব দিবেন যিনি দশ বৎসর পর্য্যন্ত নিষ্করে তদ্ভূমি ভোগদখল করিবেন । এতদ্রূপে একেবারে সাড়ে দশ বৎসরের রাজস্ব দিলে পোনর বৎসর ও সাড়ে বার বৎসরের কর দিলে বিংশতি বৎসর ও চতুর্দশ বৎসরের কর দিলে পঁচিশ বৎসর ও সাড়ে পোনর বৎসরের কর দিলে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত নিষ্করে ভোগ দখল করিতে পারিবেন । যাহারা পঞ্চ উওরূপে পাটা করিয়া জমী ভোগ করিতেছেন তাহারাও এইরূপে আপনারদের ভূমি নিষ্কর করিতে পারিবেক কিন্তু বিংশতি বৎসরের অধিক নয় । যাহারা এতদ্রূপে আপনাদের ভূমি নিষ্কর করিতে বাসনা করেন তাহারা বোর্ড-রিবিনুতে কিম্বা কলিকাতার কালেক্টরি দপ্তরে দরখাস্ত করিলে নিয়মানুসারে নূতন পাটা পাইতে পারিবেন । [স. সে. ক. ১ । পৃ ১৭৫] ।

দাঁড়ির সংখ্যা — ৬

সম্ভাব্য দাঁড়ির সংখ্যা - X শব্দের মধ্যে X

সংযোজক শব্দ - ১২ বাক্য বা বাক্যাংশের মধ্যে ১২

উ ১৭ । ৪ জুলাই, ১৮২১, সমাচার দর্পণ -

করস্থাপন । - কলিকাতা এবং তৎউত্তরোত্তরাঞ্চল হইতে জলপথে তমলক ক্ষীরপাই ঘাটাল রাধানগর এবং মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান সকলে যাইতে হইলে উলুবেড়িয়ার বাসপাতির খাল অথবা তেমোয়ানি প্রভৃতি দুর্গমস্থান হইয়া যাইতে হইত কিন্তু বাসপাতির খালে বর্ষা ভিন্ন অন্য কএক মাস বারির সমূহ অপ্রতুল হইত সুতরাং

অগ্রহায়ণাবধি প্রায় আষাঢ় পর্যন্ত দ্বিতীয় পথ হইয়া যাইবার ঘটনা হইত কিন্তু তৎঘটনায় লোকসকল অত্যন্ত ভীত হইতেন যেহেতুক তাহাতে বিষম সাহস অপেক্ষা করে তদ্ভিন্ন বিলম্বের সম্ভাবনা [।] এই সকল অনুসারে নিবারণ করণে শ্রীলশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর উলুবেড়ে হইতে মহেশডাঙ্গা পর্যন্ত এক খাল খনন করিয়াছেন [।] প্রায় বৎসরাবধি নৌকাদি তাহাতে গমনাগমন করিতেছে [।] সংপ্রতি রাজকর্ম্ম সম্পাদক কর্ত্তৃক এই নিয়ম স্থাপন হইয়াছে যে সেই খাল দিয়া নৌকাদি গমনাগমন করিলে নৌকাতে দাঁড় থাকিবেক প্রত্যেক দন্ডে দুই আনা পরিমাণে কর লইবেন [।] এই কর্ম্মনির্ব্বাহ জন্য তথায় কএকজন আমলা নিযুক্ত হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মে করগ্রহণ করিতেছে । (বাঙ্গালা সমাচারপত্র হইতে নীত ।)
[স. সে. ক. ১ । পৃ ৩৩৩]

দাঁড়ির সংখ্যা - ১
সম্ভাব্য দাঁড়ির সংখ্যা - ৪) শব্দের মধ্যে ১
সংযোজক শব্দ - ৮ (বাক্যের মধ্যে ৭

১৮১১, ১৮২৪, ১৮২৫ ও ১৮২৯ - এর এই চারটি উদাহরণের ভেতর স্টাইলের যে- ঐক্য দেখা যায়, সেই ঐক্য বস্তুত এইবিষয়ক সংবাদ-মন্তব্য ও নিবন্ধে বরাবরই উপস্থিত । ১৮১১ এর দীর্ঘ বিজ্ঞাপনে ও ১৮২৫ সালের 'ইশ্‌তেহার'-টিতে দাঁড়ি এত যথাযথ ব্যবহার করা হয়েছে যে নতুন কোনো দাঁড়ি দেয়ার জায়গা নেই অথচ যথাক্রমে ১১ ও ১৬টি সংযোজক শব্দের সবগুলিই ব্যবহৃত হয়েছে বাক্যের সঙ্গে বাক্যকে গ্রথিত করার কাজে । কিন্তু এই সংযোজক পদগুলি কখনোই উপস্থিতযতি হিসেবে ব্যবহৃত হয় নি, আইনের শর্তের টানে যে-বাক্যগুলি পরস্পরের সন্নিহিত হয়েছে তারা সেই বাক্যগুলির ভেতর প্রয়োজনীয় সংযোজন ঘটিয়েছে মাত্র । ১৮২৪ ও ১৮২৯ সালের উদাহরণ দুইটিতে আজকের অভ্যাসে যথাক্রমে ৬ ও ৪ জায়গায় নতুন করে দাঁড়ি দেয়া যায় বটে কিন্তু সেই জায়গাগুলিতে যতিচিহ্নের অবস্থা বাক্যগঠনের ভেতরই রয়ে গেছে । এই দুটি উদাহরণেও বাক্যের ভেতরে যথাক্রমে ১০ ও ৭ বার সংযোজক পদ ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও তা বাক্যের প্রবহমানতাকে ক্ষতিগ্রস্ত তো করেই না, বরং , সরকারি আইনটিকে দৃঢ় নির্দিষ্টতা দেয় ।

যতির স্পষ্টতা

ছয়

ত্রিশ দশকের শুরু থেকে হিন্দুকলেজে শিক্ষিত বাঙালি যুবকদের একটি প্রধান অংশ বাঙালি সমাজে সবচেয়ে প্রগতিশীল চিন্তা ও কর্মের প্রতিনিধিগোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। ইয়ংবেঙ্গল দল ইংরেজিচর্চার ফলে আধুনিক ভাষা সম্পর্কে একটা সচেতনতা অর্জন করেছিলেন। তার সঙ্গে ছিল গণতান্ত্রিক য়ুরোপের সামাজিক জীবন সম্পর্কে সশ্রদ্ধ আগ্রহ। এই দুইয়ের মিলিত প্রয়োগক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল তাঁদের দলের বা মতের সংবাদসাময়িকপত্র। ফলে, বাঙালি সমাজের এলিটদের একটি বিশেষ অংশ একটি নির্দিষ্ট জীবনাদর্শের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধভাবে সংবাদসাময়িকপত্র। তাঁদের গোষ্ঠীর মুখপত্র হিসেবে প্রকাশ করলেন। এই ধারাতেই পরবর্তীকালে রামমোহন অনুগামীরা তাঁদের মতগোষ্ঠীর মুখপত্র হিসেবে সংবাদসাময়িকপত্র প্রকাশ শুরু করেন।

এরই ফলে গদ্যচর্চায় বিষয় ও লেখকের অন্বয় ও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির নির্দিষ্টতার প্রবণতা দেখা দিল। গদ্য যখন লেখকের আবেগ ও মননের প্রতিফলন হয়ে উঠতে চায় তখন গদ্যের ভেতর লেখকের ব্যক্তিত্বের সংক্রমণ ঘটে। সেই সংক্রমনের ফলে গদ্যের এক-একটা বিশিষ্ট বাচন ও স্টাইল তৈরি হয় যা বক্তব্য উপস্থাপনের ভেতর একটা সঙ্গতি সৃষ্টি করে।

তাই, ত্রিশের দশকে যখন সংস্কৃত বাক্যরীতির অনুসরণে উপস্থিত যতি ব্যবহার করে বাক্যগঠনের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, তার পরই সংযোজক পদ ও যতিচিহ্নের সঙ্গতি সাধনের চেষ্টাও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। ঠিক সমানুক্রম অনুসরণ করে না হলেও, ত্রিশের দশকের গোড়ার নাগাদ সংবাদসাময়িকপত্রের গদ্যে দাঁড়ি ব্যবহার সম্পর্কে একটা সতর্কতা ও সচেতনতা দেখা যায়। এই সব রচনায় দাঁড়ি ব্যবহারের একটা যুক্তি ও পদ্ধতি আছে —— এই যুক্তি ও পদ্ধতি বিষয়ের প্রসঙ্গভাগ, অনুপ্রসঙ্গ নির্দেশ ও প্রসঙ্গান্তরের ওতপ্রোত।

উ-১৮। <u>২৫ নভেম্বর, ১৮৩৭, সমাচার দর্পণ</u> -

শ্রীযুত সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।- প্রিয় সম্পাদক মফঃসল সম্পর্কীয় পোলিসের কার্য্য শোধনার্থ সংপ্রতি গভর্ণমেন্ট লোক নিযুক্ত করিয়াছেন [,] আমি এ বিষয় শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইলাম। বহুকালাবধি আমার প্রার্থনা ছিল মফঃস্থলের পোলীসের প্রতারণাজালে বদ্ধ হইয়া দীন দরিদ্র প্রজারা যে সমূহ কষ্ট পাইতেছেন গবর্ণমেন্ট কৃপাবলোকনপূর্ব্বক তাহা নিবারণ করেন [-] সেই আশা এখন সফল হইবে। আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি মফঃসলের পোলীসের লোকেরা অর্থলোভে না পারে এমত অপকর্ম্মই নাই [।] বিশেষতঃ বর্দ্ধমানে আসিয়া পোলীসের হস্তে স্বয়ং ঠেকিয়া আরো শিক্ষা পাইলাম। সম্পাদক মহাশয়, [,] বর্দ্ধমানের স্বর্গীয় মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের

কনিষ্ঠা শ্রী শ্রী শ্রীমতী মহারাণী বসন্তকুমারী ফৌজদারী সম্পর্কীয় বিচার প্রাপণার্থ আমাকে মুক্তিয়ার করিয়াছেন । অতএব আমি বর্ধমানে থাকিয়া তাহার কর্মনির্বাহ করিতেছি [।] আপনি বুঝিতে পারেন পরানবাবু ও তাঁহার পরিবারেরা আমার বিপক্ষ সুতরাং তাঁহারদিগের ক্রোড়ের মধ্যে থাকিতে হইল । একারণ আপন সম্ভ্রম রক্ষার্থ বাসাতে কয়েকজন ব্রজবাসী রাখিয়াছি এবং শ্রীযুক্ত মহারানীও আমাকে তদপযুক্ত সম্ভ্রমেতেই রাখিয়াছেন [।] আমাকে এইরূপ দেখিয়া বর্ধমানের পোলীসের কোন আমলা লোভেতে উন্মত্ত হইয়া প্রথমত বরকন্দাজ দিয়া পাঠাইল ʼআমি এক দিবস বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিব" কিন্তু পোলীসের সে আমলার প্রতি আমার চিরকাল ঘৃণা আছে । অতএব আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না [।] এইরূপ দুই তিন দিবস বলিয়া শেষে আমার নিকট এক পরওনা পাঠাইল [।] তাহার অভিপ্রায় এই যে আমি ঐপরওনারূপ কার্য্য করিব না তবেই সে মিথ্যা এক মোকদ্দমার ভয় দেখাইয়া আমার স্থানে বিলক্ষণ হাত মারিবে ।

ঐ আমলার পরওনাতে লেখে কলিকাতা হইতে যে ব্যক্তি আসিয়া বাসা করিয়া রহিয়াছে এবং আপনাকে বাবু কহলাইতেছে তাহার নাম সাকিম জিলা এবং বাসাতে কত লোক থাকে আর কখন কোন লোক বাসাতে কি কারণে আইসে এবং ঐ বাবু কহনেওয়ালা কি নিমিত্তে আসিয়াছে এই সকল অবিলম্বে লিখিয়া থানায় পাঠাইতে হইবে [।] যদি না দেয় তবে তাহার কারণ লিখিবে আর বাসায় যখন যে লোক আসিবে তাহার আসিবার কারণ প্রত্যহ লিখিয়া থানায় পাঠাইতে হইবে । (যদি না দেয় তবে তাহার কারণ লিখিবে আর বাসায় যখন যে লোক আসিবে তাহার আসিবার কারণ প্রত্যহ লিখিয়া থানায় পাঠাইয়ে হইবে ।) আমি তাহার এইরূপ অসম্ভ্রমের লেখা দেখিয়া একেবারে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলাম এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম এই মূর্খ আমলাকে প্রতিফল না দিয়া জলগ্রহণ করিব না । কারণ আমি ইঙ্গলণ্ডীয় শ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার প্রজা [।] তাঁহার অধিকার মধ্যে যথা ইচ্ছা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বাস করিতে পারি [।] তাহাতে পার্লিমেন্টের অথবা কোম্পানি বাহাদুরের কোন আইনের মধ্যে নিষেধ নাই । তবে ঐ আমলা আমাকে এপ্রকার অসম্ভ্রমের শব্দ কি কারণ লেখে । পরে তৎক্ষণাৎ এই বিষয় ম্যাজিষ্টেট সাহেবের নিকট লিখিয়া পাঠাইলাম কিন্তু বিজ্ঞবর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এ বিষয়ে আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছেন । পত্র পাঠমাত্র তিনি কহিলেন বাবুর নিকট আমলার এ প্রকার পত্র পাঠাইবার কোন অধিকার নাই [,] তাহাকে আমি বিলক্ষণ প্রতিফল দিব । তাহাতে ঐ আমলার মাথায় ছাই পড়িল এবং ভয়েতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল কিন্তু আমি তাহাকে উঠিতে দেই নই ।

. . . শ্রীগৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ । [স— সং— ক ২ । পৃ ২৬১] ।

(প্রথম বন্ধনী চিহ্নিত অংশটুকু সম্ভবত ছাপার ভুলে পুনরুক্তি)

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ উনিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের একজন প্রথিতযশা সাংবাদিক। তাঁর স্বাক্ষরিত এই চিঠিতে তখনকার সাংবাদিক গদ্যভাষায় স্টাইলের বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান প্রসঙ্গে এই স্টাইলের সঙ্গে যতিব্যবহারের সম্পর্কটাই শুধু আলোচ্য।

স্টাইলের দিক থেকে লক্ষণীয় যে চিঠিটির গড়নের ভেতর একটি অখণ্ডতা আছে। বাংলায় গদ্যচর্চায় বাক্যগঠনের প্রাথমিক পর্বে প্রতিটি বাক্য হিসেবে তৈরি হয়েছিল। একটি বাক্য থেকে আর একটি বাক্য খুব স্বাভাবিকভাবে তৈরি হয় নি। ফলে একটি বাক্যের সঙ্গে তার পরবর্তী বাক্যের একটা কৃত্রিম গ্রন্থন অনেকসময় প্রয়োজন হত। সেই কৃত্রিম গ্রন্থনের দায় এখনো এতটাই বেশি যে যতিব্যবহারের অবকাশটুকুও যেন লেখক পান না।

সেই প্রাথমিক পর্বে বাক্যগঠনের উপকরণবিন্যাস সম্পূর্ণ হওয়ার সময় বা খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে গেলে একটি বাক্য তার পরবর্তী বাক্যের সূচনার সম্ভাবনায় শেষ হয়। সেই সমাপ্তি যতিচিহ্নের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। আর বাক্যদুইটির পারস্পরিক বন্ধন নিহিত থাকে সমগ্র রচনারই শৈলী শৃঙ্খলায়, কোনো কৃত্রিম সংযোজনে সেই বন্ধন দেখানো অপ্রয়োজনীয়।

এই চিঠিটির সূচনাতে খানিকটা আত্মনিরপেক্ষ পরোক্ষতা আছে। তিনটি দাঁড়ির পর 'সম্পাদক মহাশয়' বলে আবার শুরু করে লেখক সেই জায়গাটি চিহ্নিত করেছেন যেখানে ঐ পরোক্ষতা থেকে তিনি প্রত্যক্ষতায় আসছেন। সেই প্রত্যক্ষতায়, আবার কিছুটা নিরাসক্তিতেও তিনি ঘটনার বিবরণ দিতে থাকেন ও সেই বিবরণে চারবার দাঁড়ি ব্যবহার করেছেন। 'বর্ধমানের পোলিসের কোন আমলা লোভেতে উন্মত্ত হইয়া', 'আমলার প্রতি আমার চিরকাল ঘৃণা আছে' এই বাক্যাংশগুলিতে সেই নিরাসক্তির ভঙ্গি তিনি আর রাখেন না। তারপর পরোয়ানায় কি লেখা আছে, তাতে তাঁর কি প্রতিক্রিয়া হল ও তিনি কি করলেন এই প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত ভূমিকার বিষয় লেখেছেন। একটি স্বতন্ত্র প্যারায় এই অংশটি চিঠির আগের অংশ থেকে আলাদা। চিঠির গঠনশৈলীর অখণ্ডতার প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা চলে —— আবার তিনি সূচনার আত্ম নিরপেক্ষ পরোক্ষতার ভঙ্গিতে ফিরে মফঃস্বলের পুলিস সম্পর্কিত প্রাথমিক মন্তব্যকে সিদ্ধান্তের মর্যাদা দিয়ে শেষ করতে পারতেন।

স্টাইলের এই অখণ্ডতা চিঠির গদ্যের ভেতরেও একটি অখণ্ডতা এনেছে। আধুনিক অভিজ্ঞতায় হয়তো এই চিঠির ১২টি জায়গায় দাঁড়ি, কমা ও ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহার করা চলে -। কিন্তু দাঁড়ি ছাড়া অন্য কোনো চিহ্ন ব্যবহার না করা ও দাঁড়িও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার না করা সত্ত্বেও চিঠিটির মানে বুঝতে কোথাও আটকায় না, এমন কি চিঠিটির গতিও কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় না।

এটা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে গৌরীশঙ্করের যতিব্যবহারের মধ্যে একটা পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতিটি তিনি গদ্যভঙ্গির অখণ্ডতা রক্ষা করেই প্রয়োগ করেছেন।

গভর্নমেন্ট পুলিসের কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য লোক নিয়োগ করেছেন — এই সংবাদটির পর প্রথম দাঁড়ি। দুটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকলেও আসলে 'লোক'-এর আগে 'যে' এই সাপেক্ষ সর্বনামটি সুপ্ত আছে। দ্বিতীয় দাঁড়ির বেলায় 'যে - সে' এই সাপেক্ষ সর্বনামটি ব্যবহারের ফলে সম্পূর্ণ একটি বাক্য হয়েছে। এরপরে তিনটি সমাপিকা ক্রিয়াকে তিনি একটিও সংযোজক পদ ব্যবহার না করে একটি দাঁড়িতে আটকেছেন। তাতে 'বিশেষত:' শব্দটি থাকায় একটি স্বতন্ত্র বাক্যের আভাস আসে বটে কিন্তু গৌরীশঙ্কর বর্ধমানের অভিজ্ঞতাকে একটি অংশে রাখতে চান। এই তিনটি দাঁড়িতে চিহ্নিত ক্রম দীর্ঘ তিনটি বাক্যে সূচনাংশ শেষ।

এর পরের বাক্যটি একটি সরল বাক্য। কিন্তু তার পরের বাক্যটিতে 'আমি' 'আপনি' 'পরাণবাবু ...' তিনটি কর্তা তিনটি ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাই সিদ্ধান্তে আসার আগে 'সুতরাং' — এই সংযোজক পদটি ব্যবহার করতে হয়। এইখানে লেখক একটা দাঁড়ি দিয়েছেন। তার কার বর্ধমানে তাঁর অবস্থানের বৈশিষ্ট্যটিকেই তিনি এই বাক্যের প্রধান বক্তব্য হিসেবে রাখতে চান।

প্রতিটি প্রসঙ্গকেই তিনি এক দাঁড়ির দ্বারা আলাদা করেছেন — 'আমাকে এইরূপ দেখি বর্ধমানের পোলীসের কোন আমলা' কি করল, তাঁর অসম্মতি ও আমলার পরোয়ানা পাঠানো, পরোয়ানার কি লেখা আছে, 'আমি ... ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলাম', 'কারণ আমি ভিক্টোরিয়ার প্রজা', ম্যাজিস্ট্রেটকে চিঠি, ম্যাজিস্ট্রেটের উত্তর। অর্থাৎ দাঁড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে গৌরীশঙ্করের সচেতনতা সক্রিয় - আধুনিক অভ্যাসে ব্যবহার খানিকটা উদার হতে পারত এই সম্ভাবনা সত্ত্বেও। দাঁড়ি ব্যবহারের এই সচেতনতার সঙ্গে 'বিলক্ষণ হাত মারিবে', 'বাবু কহানেওয়ালা', 'আশায় ছাই পড়িল' — এই বুলি ব্যবহারের ফলে গদ্য হয়ে উঠেছে নিয়মিত অথচ প্রবহমান।

বাক্যের গড়ন, বাক্যের সঙ্গে বাক্যের সম্পর্ক, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গে যাওয়া, যুক্তি-কাঠামো, সেই কাঠামোর সঙ্গে বাক্যের সঙ্গতি, সচেতন আত্মপ্রক্ষেপ বা নিরাসক্তি — গদ্যে স্বতন্ত্র স্টাইলের এই আবশ্যিক উপকরণগুলি সম্পর্কে সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গেই যতিব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা কাজ করছে ও যতি ব্যবহারে একটা পদ্ধতি লক্ষ করা যাচ্ছে। গদ্যচর্চায় এগুলি শুধু শাস্ত্রীয় উপকরণ নয় বা ব্যাকরণের বিধান নয় — লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন। এরই টানে যে- বিষয় সম্পর্কে লেখকের আবেগ আছে, সেই বিষয়ক রচনায় যেন লেখকের কণ্ঠস্বরেরই প্রক্ষেপ ঘটে। কণ্ঠস্বরের অনুসরণ যতিবিন্যাসের একটি প্রধান উৎস।

উ ১৯ । ১১ জুন, ১৮৩৬, সমাচার দর্পণ

টগ সমাজের যুনাফা ।- আমারদের ইচ্ছা যে শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উত্ত সমাজের নাম পরিবর্ত্তন করেন । আমরা শুনিতেছি সকলে তাহা ঠ উচ্চারণ করিয়া ঠগের সমাজ কহিয়া থাকে । সে যাহা হউক সংপ্রতি উত্ত সমাজ যে ফরবিস বাষ্পীয় জাহাজ ক্রয় করিয়াছেন তাহা কেবল ৭০ দিবস হইল কর্ম্মে চলিতেছে । ঐ জাহাজ মাকিণীয় কোম্পানীর হস্তে থাকনসময়ে কখন তাহার খরচা পোষিয়া উঠে নাই কিন্তু ক্রেতাদের হস্তে পতিত হওন অবধি তাহাতে বিলক্ষণ লাভ হইতেছে । ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখ অবধি ৩০ এপ্রিল পর্য্যন্ত গড়ে ১৮,৮০০ টাকা উৎপন্ন হয় [।] তাহাতে ১২,১৮৫ টাকা খরচ হইয়াছে অতএব লাভ মাসে ৩,০০০ টাকার কিঞ্চিৎ ন্যূন । গড়ে ৪,০০০ টাকা লাভ হইত কিন্তু ঐ জাহাজে যে দৈব ঘটনা হয় তাহাতে ১,১০০ টাকা ও ১ দিবস হরণ হইয়াছে । [স. সে. ক. ২ । পৃ ২৪৭]

দাঁড়ির সংখ্যা - ৬
সম্ভাব্য দাঁড়ির সংখ্যা — ১
সংযোজক শব্দ -- ৬

উ ২০ । ২৯ জুলাই, ১৮৩৭, জ্ঞানান্বেষণ ।-

পয়সা । - বাজারে ১ টাকার পয়সাতে এইক্ষণে ৬ পয়সা পর্য্যন্ত যাইতেছে । পোদ্দারেরা টাকাতে ঘসা পয়সা ১৬ গণ্ডা করিয়া দিতে চাহে কিন্তু সেই পয়সা কোন কর্ম্মের নহে । কল্য আমাদের একজন বেহারাকে ।৹ আনার পয়সা দিতে হইয়াছিল [।] তাহাতে ঐ প্রকার ঘসা পয়সা দেওয়াতে সে কহিল যে ঘসা পয়সা কেহই লইবে না [।] এই ৮ গণ্ডা পয়সা এবং ৮ গণ্ডা নুড়ি তুল্য মূল্যই । কিন্তু যখন তাহার সঙ্গে অনেক বচসা করা গেল তখন কহিল যে বরং নূতন পয়সার অর্দ্ধেক আমাকে দেউন ।

গভর্ণমেণ্টের নিযুত পোদ্দারেরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য [।] বাজারের পোদ্দারো যে প্রকার পয়সা দিতে চাহে তাহারাও তদ্রূপ পয়সাও সেহ দরে দিতে চাহে [।] অতএব ঐ বেটারদের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট মাসে যে ৩০০ টাকা ঘরভাড়া দিতেছেন সে কেবল ভস্মে ঘি ঢালা হইতেছে । [স. সে. ক. ২ । পৃ ২৫১]

দাঁড়ির সংখ্যা -- ৫
সম্ভাব দাঁড়ির সংখ্যা - ৪
সংযোজক শব্দ - ৭

দুটি উদাহরণের কোনোটিতেই রচনাদর্শগত কোনো প্রভাব খুব প্রকট নয়। অর্থাৎ ইংরেজি বা সংস্কৃত এই দুই আদর্শের কোনো একটির সচেতন সতর্ক অনুসরণ লক্ষণীয় নয়। বাস্তব-বিবরণের টানে লেখক এক কণ্ঠস্বর আবিষ্কার করতে পারেন যে — কণ্ঠস্বর তাঁকে যথার্থ যতিব্যবহারের দিকেও নিয়ে যেতে পারে। বিশিষ্ট বাচন-এর আশ্রয়ে সেই যথার্থ যতিব্যবহারের ইঙ্গিতই এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই দুটি উদাহরণ বাণিজ্য ও অর্থ সংক্রান্ত হলেও রচনার ভেতর যে- মন্তব্য আছে তার ফলে বাণিজ্য ও অর্থসংক্রান্ত রচনার নির্দিষ্টতা এগুলিতে নেই। তৎসত্ত্বেও এই দুটি রচনার কোনোটিতেই যতিব্যবহারে বিভ্রাটের জন্য রচনার ধারাবাহিকতা বা প্রসাদগুণ নষ্ট হয় নি।

বরং অত্যন্ত ছোট এই রচনাদুটিতে খানিকটা উদারভাবেই দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়েছে, যথাক্রমে ৬ ও ৫। প্রথম উদাহরণে ৬টি ও দ্বিতীয় উদাহরণে ৭টি সংযোজক পদ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি সংযোজকপদই ব্যবহৃত হয়েছে অংশ দুটির বাচনভঙ্গির ন্যায়ে। প্রথম উদাহরণে 'টগ সমাজ'-কে 'ঠগ' সমাজ বলা হয়ে থাকে এই উল্লেখে লেখকের ব্যক্তিত্বের যে সংক্রমন ঘটে, তার ফলে পরবর্তী অংশটিতে একটা বিশিষ্ট বাচনের আভাস পাওয়া যায় — হিসেবনিকেশের অঙ্ক সত্ত্বেও। দ্বিতীয় উদাহরণে এই লক্ষণটি আরো পরিষ্কার। উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যতীতই বেহারার উক্তি ব্যবহার করায় বাচনে যে নাটকীয়তার সঞ্চার হয়, তারই টানে শেষ প্যারাটিতে লেখকের ব্যক্তিত্বের সংক্রমন ঘটে। সেই সংক্রমনে 'নিতান্ত অকর্মণ্য' 'বেটারদের' 'ভস্মে ঘি ঢালা' এই পদগুলি শৈলী হয়ে ওঠে।

কিন্তু ইয়ংবেঙ্গল বা অন্য কোনো কোনো মতগোষ্ঠীর সংবাদসাময়িকপত্রে রচনার আভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গিগত ঐক্য সত্ত্বেও রচনার বাস্তব ব্যাপারটি তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নি। সেখানেও নির্ভর করতে হত পন্ডিতদের ওপরই। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রকাশ উপলক্ষে 'সংবাদ তিমির নাশক' কাগজে লেখা হয়েছিল,

> "সন ১২৩৮ সালের ৫ আষাঢ়ে জ্ঞানান্বেষণ কাগজ প্রকাশ হয় তাহার প্রকাশক শ্রীযুত দক্ষিণানন্দন ইনি বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙগালা লেখাপড়া কিছুই জানেন না এবং বাঙগালা কথা কহিতে ভাল পারেন না তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাঙগালা সমাচার কাগজের এডিটর না হইলে নয় মাতামহদত্ত কিঞ্চিৎ সঞ্চিত আছে তাহা তাবৎকে বঞ্চিত করিয়া ঐ কাগজের জন্য কথঞ্চিৎ কিছু ব্যয় করেন একজন নটুরে ভাট মদ্যপায়িকে পন্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন" [বাঙগালা সাময়িকপত্র, ১ম খন্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৪০]

এই ব্যবস্থায় যতাদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গিগত ঐক্যের সঙ্গে গদ্যরীতির সম্বন্ধ যেমন ঘটেছে তেমনি এই দুই এর ভেদ বিরোধিতাও দেখা যায় । তাই এমন উদাহরণ প্রায়ই মেলে যেখানে প্রসঙ্গনির্দেশের সূত্রেই প্যারাভাগ ও যতিবিন্যাস ঘটছে কিন্তু গদ্যে সংস্কৃত রচনারীতির ছাঁচটা থাকছে অপরিবর্তিত ।

উ ২১ । ২১ এপ্রিল, ১৮৩৮, জ্ঞানান্বেষণ -

... বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তারা অতিশয় সভ্য ও ধনাঢ্য প্রায়ই হইয়াছেন [।] সভ্যতা ও ধনাঢ্যতা কোন২ উপায় দ্বারা হইতে পারে এতদ্দেশীয় জনগণ তাহার কিছুই অন্বেষণ না করিয়া আপনারদিগের যে স্বাভাবিক নীচাবস্থা তাহাতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করিয়া সুখসম্ভোগ করেন । ইউরোপীয়েরদিগের যে উত্তম উত্তম গুণযুক্ত উত্তমাবস্থা তদ্দর্শনে সেইরূপ উত্তমাবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বসাধারনেরি লোভ জন্মাইতে পারে । কিন্তু এতদ্দেশীয় মনুষ্যগণ এমত নীচাবস্থায় আছেন যে তদ্দ্বারা উত্তমাবস্থা একবার মানসেও করেন না [।] ইঙ্গলণ্ডীয় বিদ্বান ব্যক্তিরা যে সকল উত্তম কার্য্য করিয়াছেন তাহা এতদ্দেশীয়েরা চিত্তেও স্থান দান করেন না এবং তাহার কিছুই বিবেচনা করেন না আর স্বাভাবিক নীচাবস্থা হেতু তদ্ভাব এতদ্দেশীয়দিগের মনে একবার উদয়ও পায় না । এবং কোন দেশীয় কোন ব্যক্তির সৌভাগ্য কেবল সময়গুণেই হয় এত নহে শারীরিক পরিশ্রম চেষ্টা ব্যতিরেকে হইতে পারে না । ইউরোপীয়দিগের যে সকল অতিশয় পরিশ্রম উদ্যোগ চেষ্টা সতর্কতা বিদ্যাদ্বারা এমত অনুপম সভ্যতাদিগুণ যুক্তাবস্থা হইয়াছে যে আমরা তন্নিমিত্ত তাঁহারদিগের প্রাংসা করি । ইঙ্গলণ্ডীয়দিগের মূলধনের উত্তমরূপে ব্যবহার্য্যতা হেতু যে ধনাঢ্যতা ইহা সর্ব্বসাধারণ জনকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে [।] কেবল বিদ্যা দ্বারা যে জনদিগের ধনাঢ্যতা সৌভাগ্য হয় এমত তাঁহারা বলেন না [।] বাণিজ্যাদি সহকারে সৌভাগ্যাদি হয় । তন্নিমিত্ত বলি যে এতদ্দেশীয় জনগণ স্বাভাবিক আলস ও নিদ্রা প্রভৃতি যে দোষবর্গ তাহা পরিত্যাগ করিয়া উত্ত বাণিজ্যাদিরূপ অস্ত্র শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক সৌভাগ্যের বিরোধী যে কুস্বভাব তাহাকে জয় করিয়া সৌভাগ্যকে প্রবল করুন । আর পরমেশ্বর বহুগুণযুক্ত উর্ব্বরা ভূমি প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার উপায়ও প্রদান করিয়াছেন ইহা পাইয়া কি উত্তমরূপে ব্যবহার করা উচিত হয় না [?] এই সময়ে অনেকের উত্তমতা ও সভ্যতা হইয়াছে অতএব এতদ্দেশীয়দিগের উচিত যে পশ্চিমপ্রদেশীয়দিগের যে সকল সদুপায় দ্বারা সভ্যতা হইতেছে সেই সকল সদুপায় সদা আচরণ করেন । [স. সে. ক. ২ । পৃ ২৫৯]

রচনাটিতে আরো দুটি প্যারা আছে ।

সংস্কৃত ছন্দের অন্ধ অনুসরণের ফলে রচনাটির ভাষা জড়, কোথাও কোথাও ব্যাকরণদোষ (ইউরোপীয়দের যে সকল . . . প্রশংসা করি) আছে। বাক্যগুলির কোনো গঠনগত ঐক্য নেই — একটি বাক্য থেকে আর একটি বাক্য তৈরি হয় নি। বাক্যের পদবিন্যাসও যথাযথ নয় (প্রথম বাক্যটির 'প্রায়ই' শব্দটিকে ক্রিয়া বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, আসলে বিশেষ্যের বিশেষণ)।

গদ্যের ত্রুটিতে সর্বত্র ঠিকভাবে অনুসরণ করা না হলেও রচনাটির যতিবিন্যাসে একটা পদ্ধতি লক্ষ করা যায়। এই প্যারাটিতে মোট ৮ বার দাঁড়ি ব্যবহার করা হয়েছে। 'বর্তমান শাসনকর্তারা ... সভ্য ও ধনাঢ্য' ও 'এতদ্দেশীয় জনগণ' স্বভাবতই উচ্চাকাঙ্ক্ষী নয়, ইয়োরোপীয়দের "উত্তমাবস্থা'য় 'লোভ জন্মাইতে পারে', ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে এদেশীয়দের পার্থক্য, 'সময়গুণ' ও 'শারীরিক পরিশ্রম চেষ্টা', ইয়োরোপীয়দের যত্ন, 'ইঙ্গলণ্ডীয়দিগের মূলধনের উত্তমরূপে ব্যবহার্যতা —' এদেশীয়দের প্রতি আহ্বান, ধিক্কার ও পুনরাহ্বান — এই আটটি প্রসঙ্গকে লেখক ৮টি দাঁড়িদ্বারা চিহ্নিত করেছেন। সেই চিহ্ন ৮টি বাক্যের সীমার ভেতর আটকা থাকে নি বা একটি বাক্যের জন্য একটি দাঁড়ি ব্যবহৃত হয় নি কিন্তু দাঁড়ি দিয়ে দিয়ে রচনার প্রসঙ্গগুলিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। সমগ্র রচনাটিকে কয়েকটি প্যারায় ভাগ করা ও একটি প্যারাকে কয়েকটি দাঁড়ির দ্বারা নির্দিষ্ট অংশে ভাগ করার এই পদ্ধতি দাঁড়িচিহ্নসহ সমস্ত যতিচিহ্নের যথাযথব্যবহারের দিকে যাওয়ারই একটা প্রধান প্রবণতা।

দাঁড়ি দিয়ে প্রসঙ্গান্তর সংকেতিত করার এই সচেতনতার আর একটি জরুরি পরোক্ষ সাক্ষ্য মোট ২১টি সংযোজক পদের ভেতর ৪টি ব্যবহৃত হয়েছে শব্দের সঙ্গে শব্দের সংযোজনে, ৮টি দাঁড়ির মধ্যে ৪টি দাঁড়িচিহ্নিত অংশ শুরু হয়েছে কিন্তু, এবং, তন্নিমিত্ত, আর এই চারটি সংযোজক পদের দ্বারা, বাকি সংযোজকপদগুলি হয় সাপেক্ষ সর্বনাম, নয় তো 'আর' 'এবং' ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রসঙ্গান্তর বোঝাতে দাঁড়ি ব্যবহারের পদ্ধতি সংযোজক পদের দ্বারা অর্থাৎ বাক্যের ব্যাকরণগত গঠনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, — নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বক্তব্যের উপস্থাপনভঙ্গির সঙ্গতিতে অর্থাৎ লেখকের স্টাইলের সঙ্গতিতে। যতিব্যবহারে এইভাবে স্টাইলের অংশ হয়ে ওঠা প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল।

কিন্তু সংস্কৃত রচনারীতির ছাঁচের ভেতর এই প্রবণতা সম্পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠতে পারে না। বিকাশের গতি আর রচনারীতির আধারের ভেতর বিরোধ দেখা দেয়। এই পর্বে বা এই বিশেষ প্রবণতার ভেতর যতিবিন্যাস ও রচনারীতির এই অন্তর্বিরোধ রচনার ভেতরে মাঝে মাঝে এক শৈলী সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারে যা যথাযথ শৈলী বিকাশের পথে বাধা হতে পারে। এই শৈলীসঙ্কট আবার অন্বেষ্যময় বিষয় সম্পর্কে একটা দ্বিধার সঙ্গেও জড়িত। বিশেষত জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার লেখক ও পৃষ্ঠপোষকরা কাজ করছিলেন ভারতীয় হিন্দুসমাজের কাঠামোয় য়ুরোপীয়

দৃষ্টিভঙ্গিতে। একটি খাঁটি হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পর্কিত রচনা থেকে এই শৈলীসঙ্কটের উদাহরণ দেয়া যায়।

উ ২২। 27 এপ্রিল, ১৮৩৩, জ্ঞানান্বেষণ -

গত সন্ন্যাসিবিষয়ক নীলের উপাখ্যান। - দেশদেশান্তর ভ্রমণ কারিরা কহেন যে পৃথিবীতে যত জাতি আছে তাহার মধ্যে হিন্দুজাতির আচার ব্যবহার অত্যাশ্চর্য্য এবং বহুকালাবধি ইঁহারা যেরূপ কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন তদ্দ্বারাই এ জাতি বিলক্ষণ পরিচিত আছেন [।] যে সকল ভ্রমণ কারিরা পাঠকবর্গের অগোচর আশ্চর্য্য২ বিষয় দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা উপরোক্ত কথা সপ্রমাণ করিয়া কহিয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরাও ঐ মত বোধ করিবেন [।] হিন্দুদিগের মধ্যে একটা সামান্য কথা প্রচলিত আছে যে প্রাচীন মদিরিকা ও বন্ধু অত্যন্ত প্রিয়পাত্র [।] এতদ্বিষয়ে যদ্যপি ইঙ্গলন্ডীয়েরা সুধারাকরণে অনুকূল হন তবে হিন্দুরা বলিবেন যে প্রাচীন ব্যবহার প্রাচী মদিরিকা ও বন্ধু হইতেও অধিক গুরুতর।

উপরে যাহার বর্ণনা করা গেল তাহার তাৎপর্য্য এই যে তদ্বিষয়ে কিছু উদাহরণ দর্শান যায় এবং অস্মদ্দেশীয় লোকেরা এরূপ উদাহরণাদিকে অতিযথার্থ বোধ করে।

কিন্তু গত সন্ন্যাসবিষয়ক নীলোৎসব দর্শন করিয়া তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ উক্তি করাতে পাঠকগণের সন্তোষ জন্মিতে পারে যেহেতু চড়কপূজা বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের বিশেষ মনোযোগ প্রার্থনা করা গিয়াছিল। অতএব এখনও তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য প্রকাশ করিবার সুসময় বটে। চিৎপুরের রাস্তায় অসংখ্য ঢাকের মহাশব্দ এবং রাস্তার উভয় পার্শ্বের বাটির বারান্দার উপর লোকের মহাকোলাহল হয়। সন্ন্যাসির দল সকল বান প্রভৃতি ফুড়িয়া বাদ্য সহিত আসিল [।] এই সকল বেলা বেলা ১ ঘন্টা পর্য্যন্ত দেখা যায় [।] পরে তামাসা যাহা দর্শনার্থে অনেক লোক জমা হয় তাহার ক্রমে ক্রমে হইয়া আসিতে লাগিল। বাঁশবাঁকারি ও কাগজমন্ডিত একটা পাহাড় নির্ম্মিত হইয়া নীল ও রক্তবর্ণের রং করা গিয়াছিল [।] তদুপরি একটা প্রকান্ড মন্দির [,] তন্মধ্যস্থিত কাগজে নির্ম্মিত হিন্দুর দেবতারা [,] ইহাই দেখিয়া প্রথমে দর্শকগণেরা চমৎকার ভাবিলেন [।] ইহাতে তামাসা এই আছে যে কয়েকটা সোনার পুত্তলিকা বানাইয়াছিল [,] তৎপরে ময়ূরপঙ্খী দেখা গেল [,] তাহা বাঁশ বাঁকারিদ্বারা নির্ম্মাণ হয় [,] মুখটা ময়ূরাকার [,] তাহাতে নানা চিত্রবিচিত্র করা গিয়াছিল [।] তাহার উপরে কয়েকজন

লোকেতে গান বাদ্যকরও [করত] দাঁড় ফেলিতেছিল । তাহা একটা পাঠশালার ন্যায় কিন্তু বালকের নহে [,] সেটা প্রকান্ড মনুষ্যের বিদ্যালয় [।] ইহা গুরুমহাশয় ছাত্রগণের মূর্খতা দেখিয়া লজ্জিত হইয়া কহিলেন আমি ইহাদিগকে আর মারিয়া সোজা করিতে পারি না । লোকেরা হাসিতে২ ঘন্টা করতাল ধ্বনি শ্রবণ করিতে পারিলেন । পরে গোদযুক্ত একটা কুব্জ পুরুষ চন্দনাদি দ্বারা শরীর আবৃত করত দেবতাতুল্য হইয়া প্রকাশমান হইবায় অন্য একজন তাহার গোদপূজা করিতেছিল এই সং দেখিয়া বড়ই হাসি ধূম পড়িল কিন্তু দেবপূজা করেন যে হিন্দু তিনি কিরূপে গোদ পূজা করিলেন তাহা আমরা বলিতে পারি না [।] ঐ সংটা প্রকৃত গণেশের ন্যায় সাজাইয়াছিল । ...
(বিনয় ঘোষ — সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৪ পৃ ৭১৫) ।

দাঁড়ির সংখ্যা -- ১০

সম্ভাব্য দাঁড়ির সংখ্যা — ১০

সংযোজক পদ — ১৭

একটি দীর্ঘ রচনা থেকে এই অংশটি উধৃত করা হয়েছে । রচনাটির ভেতর প্যারাভাগ করার যথাযথ নির্দিষ্টতা আছে । প্রথম প্যারায় ভারতীয় রীতিনীতি, দ্বিতীয় প্যারায় উদাহরণের প্রয়োজনীয়তা ও তৃতীয় প্যারায় চড়কপূজার সং বর্ণনা -- আছে । শুধু প্যারাভাগই নয়, সমগ্র রচনাটির ভেতরই ধারাবাহিকতার একটা শৃঙ্খলা আছে । 'পাঠকগণের সন্তোষ জন্মিতে পারে' 'সর্বসাধারণের বিশেষ প্রার্থনা করা গিয়াছিল' 'তামাসা যাহা দর্শনার্থে অনেক লোক জমা হয়' ইংরেজি বাক্যাদর্শের এই অন্ধ অনুসরণের ফলেও সেই শৃঙ্খলা ক্ষুন্ন হয় নি । ধারাবাহিকতার এই শৃঙ্খলার অন্যতম কারণ থাকতে পেরেছে যতিচিহ্নের সঙ্গত ব্যবহার ।

তৃতীয় প্যারায় সং-এর বর্ণনায় ৬টি দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়েছে (রচনাংশে মোট দাঁড়ির সংখ্যা ১০) । আরো ৭টি দাঁড়ি এই অংশে দেয়া যেতে পারে । কিন্তু দাঁড়ি না দেয়ার ফলেও বাক্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশে না গিয়ে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে । তৃতীয় প্যারায় মোট ১০টি জায়গায় বাক্যের সঙ্গে বাক্যকে গ্রথিত করতে ।— কিন্তু, যেহেতু, এবং , যাহা, অতএব, — এই সংযোজক শব্দগুলি ব্যবহার করা হলেও কিন্তু বাক্যগুলি স্বাতন্ত্র্য রাখতে পেরেছে আর এই শব্দগুলির হেতুবাচকতা ও সাপেক্ষতাই প্রধান হয়ে ওঠে,—— এরা যতিচিহ্ন ব্যবহারের বিকল্প হয়ে ওঠে না ।

অথচ সমগ্র রচনাটি সম্পর্কে এ-সিদ্ধান্ত চলে না । প্রথম দুইটি প্যারায় দাঁড়ি পড়েছে মাত্র ২বার, দুটি প্যারার শেষে । আর এই দুই প্যারায় সম্ভাব্য দাঁড়ির সংখ্যা দাঁড়ায় অন্তত ৩ অথচ মোট ১০ বার, যে, যদ্যপি, ব্যবহার করা হয়েছে । আর এই ১০টি জায়গায় দিকে তাকা

ধরা পড়ে কিভাবে সংযোজক পদ বাক্যের সঙ্গে বাক্যকে গেঁথে চলেছে ও যতিব্যবহারের অবকাশকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে । অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তৃতীয় প্যারায় ১০টি সংযোজক পদ আর প্রথম দুই প্যারায় ১০টি সংযোজক পদরে ব্যবহারের তুলনামূলক আযোচনা করলেই এই সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয় ।

রচনার এই অংশের ভেতর লেখকের শৈলীসঙ্কটের প্রকৃতি খুব স্পষ্ট ধরা পড়ে । যতক্ষণ তিনি ভারতীয় হিন্দুসমাজের রীতিনীতি সম্পর্কিত তত্ত্বঘেঁষা ভূমিকাসূচক প্যারা লিখছেন ততক্ষণ সংস্কৃত ছকের ভেতর আছেন । তারপর যখনই চড়কের সং বর্ণনা করতে যাচ্ছেন তখনই বাস্তব বর্ণনার টানে দাঁড়ি ব্যবহার করছেন । যেখানে করছেন সেখানেও ফাঁকা থেকেই যাচ্ছে, ইচ্ছে করলে পূরণ করে নেয়া সম্ভব ।

কিন্তু এই সমস্ত চেষ্টাই/যথার্থ যতিবিন্যস্ত বাংলা গদ্যের পথ প্রস্তুত করেছে ।

তিরিশের দশকে মতগোষ্ঠী হিসেবে সংহত হলেও বাংলা রচনায় অক্ষমতার জন্য ইয়ংবেঙ্গলদের নির্ভর করতে হত পন্ডিতদের ওপর । কিন্তু এরপর থেকেই এই নির্ভরতা যেমন একদিকে কমে আসতে থাকে, তেমনি পত্রিকা পরিচালনার ত্রিস্তর ব্যবস্থারও বদল ঘটছিল, পত্রিকার প্রযোজক-প্রকাশকই হয়ে উঠছিলেন লেখক ও সম্পাদক । পরন্তু ইয়ংবেঙ্গলদের য়ুরোপীয় আদর্শও এই পরবর্তীদের কাছে একমাত্র আদর্শ হিসেবে সক্রিয় ছিল না । ফলে চল্লিশের দশকের গোড়ায় বাংলা সাংবাদিকতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটল । এই যুবকদের মধ্যে চল্লিশের দশকের গোড়ায় দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য, বিষয়ের ঐক্য ও লেখা আর বিষয়ের ভেতর সাম্য যেমন দেখা গেল, তেমনি আবার বিষয়ের ভারতীয়তার ঐক্যে তাঁদের সঙ্গে সমাজের যোগটা হল আরো দৃঢ় । অপরদিকে— যতি ব্যবহার ও গদ্য স্টাইল সম্পর্কিত ত্রিশ দশকীয় ইয়ংবেঙ্গলি সচেতনতাই চল্লিশের দশকের গোড়া থেকে বেঙ্গল স্পেকটেটর, বিদ্যাদর্শন ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মধ্য দিয়ে যতিচিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কিত একটি নীতি প্রতিষ্ঠিত করে ফেলছিল । কোনো একজন লেখক বা কোনো একটি পত্রিকার সতর্ক সচেতন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কখনোই এই রীতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা, হয়ও নি । জনসংযোগের দায়ে ও গদ্যশৈলীর স্বতন্ত্রতার সাধনায় সংবাদসাময়িকপত্রের গদ্যচর্চাতেই এই রীতি অভ্যস্ত হয়ে উঠছিল ।

এই অভ্যাসের কোনো কালানুক্রমিকতা যেমন নেই, তেমনি আবার দাঁড়িচিহ্ন ব্যবহারের অভিজ্ঞতা ও নিহিত ও উপস্থিত যতি দ্বারা যতিচিহ্নের কাজ সেরে নেয়ার প্রয়াস এই সবের মধ্য দিয়েই যতিচিহ্ন ব্যবহারের এই সচেতনতা তৈরি হচ্ছিল । সময়ের দিক থেকে এই প্রবণতাকে ১৮৪২ সাল নাগাদ চিহ্নিত করা যায় —— বেঙ্গল স্পেকটেটর (এপ্রিল, ১৮৪২) বিদ্যাদর্শন (জুন ১৮৪২) ও তত্ত্ববোধিনী (আগস্ট ১৮৪৩) পর পর প্রকাশিত হয়েছে ।

বেঙ্গল স্পেকটেটরের প্রধান পরিচালক ছিলেন রাজগোপাল ঘোষ ও তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র । বিদ্যাদর্শন ও তত্ত্ববোধিনী এই দুটি পত্রিকারই প্রধান লেখক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত । পরে তরুণ বিদ্যাসাগরও তত্ত্ববোধিনীর অন্যতম প্রধান লেখক হয়ে ওঠেন । বাংলা সংবাদসাময়িকপত্রে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ও আধুনিক চিন্তা ও চেষ্টার উদ্বুদ্ধ নতুন যুবকদের প্রবেশ ঘটল । ইতিপূর্বে বাংলা সাময়িকপত্র প্রধানত সামাজিক আন্দোলনের বিতর্ক বিশেষ কোনো মত প্রচার করত । এই নতুন সংবাদসাময়িকপত্রে বিতর্কের সেই সংকীর্ণতার বাইরে আনার চেষ্টা হয় । ফলে সাময়িকপত্রের গদ্যভাষার ওপরও তার প্রভাব পড়ে ও সেই প্রভাবের ফলে যতিচিহ্ন-ব্যবহারের ক্ষেত্রে রীতিপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাও ঘটে ।

তাই এই চেষ্টার ভেতরে খানিকটা আকস্মিকতা আছে । কমা ব্যবহার না করে শুধু দাঁড়িচিহ্নকে গদ্যের গড়নের ভেতর গ্রহণ করাটাই ছিল এতদিন একমাত্র চেষ্টা । অন্যান্য যতিচিহ্ন-সম্পর্কে কোনো অবহিতি সংবাদসাময়িকপত্রে কোথাও লক্ষ করা যায় না । কিন্তু বেঙ্গল স্পেকটেটর, বিদ্যাদর্শন ও তত্ত্ববোধিনীতে সমস্তগুলো যতিচিহ্ন একই সঙ্গে ব্যবহারের চেষ্টা শুরু হল । গদ্যের গড়নের সঙ্গে দাঁড়িচিহ্নকে মেলানোর চেষ্টা কখনোই অন্য যতিচিহ্নগুলিকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয় — সেদিক থেকে এই পত্রিকা তিনটির চেষ্টা পূর্ববর্তী চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত । আবার, যতিচিহ্ন ব্যবহার করার ফলে গদ্যের গড়নেই বদল ঘটে যায়, ফলে এই চেষ্টার ভেতর আকস্মিক নতুনত্বও অনেকখানি হঠাৎ যেন বাংলার সংবাদসাময়িকপত্র দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, ড্যাশ, উদ্ধৃতি-বিস্ময়-প্রশ্নচিহ্ন আবিষ্কার করে ফেলল ।

এই আবিষ্কার ও রীতিপ্রতিষ্ঠার মধ্যে খুব সূক্ষ্ম তীব্র নাটকীয়তা আছে । এই পত্রিকাগুলি কমা ও সেমিকোলনের ব্যবহার ও তাঁদের সঙ্গে দাঁড়ির সম্পর্ক নিয়ে অত্যন্ত কম সময়ের ভেতর নানা রকম পরীক্ষা হয়েছে ও সেই কম সময়ের ভেতরই গদ্যের গড়ন ও ন্যায়ের সঙ্গে যতিব্যবহার ওতপ্রোত হয়ে উঠতে পারে ।

এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল (১) বাংলা বাক্যের প্রাথমিক unit কোথায় তা আবিষ্কার করা ও চিহ্নিত করা, (২) সাপেক্ষ সর্বনাম ও সংযোজক পদ বাক্যকে যে দীর্ঘায়িত করে ফেলতে পারে তার কারণ কি (৩) এক-একটি প্রমঙ্গ একএকটি বাক্যের সম্পর্ক কি —— এই প্রশ্নের উত্তরে কমার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হল দাঁড়ি ব্যবহার সম্পর্কে অনিশ্চয়তা দেখা দিল । কিন্তু তার ভেতর দিয়েই যতির যথার্থরীতি আবিষ্কৃত হচ্ছিল ।

উ ২২ এপ্রিল, ১৮৪২, বেঙ্গল স্পেক্টেটর

যে সকল বিষয়ের সাধারণে সর্ব্বদা আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দু জাতীয় বিধবায় পুনর্ব্বিবাহেরও বাদানুবাদ হইয়া থাকে [।] বোধ হয়, যে সকল শাস্ত্র আছে তাহা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ, কারণ পুরুষ যদি স্ত্রীর মরণান্তর পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে তবে স্ত্রী কেন স্বীয় স্বামির পরলোক হইলে বিবাহ করণে সক্ষম না হয় এবং উক্ত প্রতিবন্ধকের সবলতায় কেবল পাপ ও ক্লেশের বৃদ্ধিমাত্র। এতদ্বিষয়ের প্রস্তাব বহু বৎসরাবধি হইতেছে কিন্তু সূচনাবধি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত অস্মদ্দেশীয় লোকের দ্বারা তৎপ্রতিবন্ধকের পোষকতায় কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশিত হয় নাই অতএব বোধহয় যে তৎপ্রতি তাঁহারদিগের দ্বেষের ক্রমশঃ শেষ হইতেছে এবং কিঞ্চিৎ কালাতীতে নিঃশেষ হইতে পারে কিন্তু যে পর্য্যন্ত উক্ত প্রতিবন্ধকে সম্পূর্ণরূপে অনাস্থা হইয়া নূতন রীতির সংস্থাপন না হয় তদবধি আমরা তদাবশ্যকতার নিমিত্তে বারম্বার অনুশীলন করিতে নিবৃত্ত হইব না।

... নারদ, শঙ্খ লিখিত, যাজ্ঞবল্ক্য এবং হারীত ইত্যাদি ঋষিরা পুনর্ভূ শব্দ (অর্থাৎ পতি মরণান্তর কিম্বা তৎকর্ত্তৃক পরিত্যাগানন্তর পুনঃ সংস্কৃতা এই শব্দ) স্ব২ সংহিতায় উল্লেখপূর্ব্বক বিশেষরূপে বিবৃত করিয়াছেন। নারদ পুনর্ভূকে তিনপ্রকারে বিভক্ত করেন যথা "যে কন্যা অক্ষতযোনি কেবল পাণিগ্রহণ মাত্র দ্বারা দূষিতা, তাহার পুনঃ সংস্কার হইলে তাহাকে প্রথমা পুনর্ভূ কহে।" "ব্যভিচারে প্রবৃত্তা যে বিধবা স্ত্রীকে শ্বশুরাদি দেশ ধর্ম্মাবলোকনপূর্ব্বক অন্যকে প্রদান করে তাহার নাম দ্বিতীয়া পুনর্ভূ"। "দেবরাদির অভাবে সবর্ণ সপিণ্ডকে বান্ধবেরা যে বিধবা স্ত্রীকে পুনর্দান করে তাহাকে তৃতীয়া পুনর্ভূ বলা যায়।"

... অনেক মুনিরা দ্বাদশবিধ পুত্র গণনা করিয়াছেন যথা ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ, কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত, শৌদ্র, কিন্তু কলিযুগে কেবল ঔরস ও দত্তক পুত্র দায়াদিতে অধিকারী। উক্ত দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে পৌনর্ভব পুত্রের নাম সুস্পষ্টরূপে উল্লেখিত আছে। এবং মনু, দেবল, নারদ, বৌধায়ন প্রভৃতি মুনি ঐ পৌনর্ভব পুত্রকে পিতৃভিন্নের অদায়াদ অথচ বান্ধবরূপে নিরুক্ত করেন ও যাজ্ঞবল্ক্য যম হারীতাদি ঋষিরা তাহাকে দায়াদ এবং বান্ধব বলেন। আর শ্রাদ্ধাদির নিয়মস্থলে পরাশর প্রভৃতি মুনি পিত্রাদির পার্ব্বন শ্রাদ্ধমাত্র নিষেধপূর্ব্বক একোদ্দিষ্টে তাহার অধিকারিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে পরপরের সমুদয় ধনাধিকার স্থলে পৌনর্ভবের স্থান নৈয়ত্য নাই, যেহেতু মনু, নারদ, বৌধায়ন, দেবল, যম, যাজ্ঞবল্ক্য ও হারীত ইঁহারা ক্রমে একাদশ, সপ্তম, দশম, অষ্টম, চতুর্থ, এবং তৃতীয় স্থানে স্থাপিত করেন।...

... বেণ রাজার রাজকালে বিধবার বিবাহ ব্যবহৃত ছিল তদ্রাজত্বানন্তর নিষিদ্ধ হইয়াছে কিন্তু শূদ্রের পক্ষে নিষেধ না থাকাতে অন্ত্যজ জাতির মধ্যে অদ্যাপি তদ্ব্যবহার প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রদেশীয় লোকের মধ্যে তাহা গান্ধর্ব্ব কিম্বা নেত্র বিবাহরূপে প্রসিদ্ধ, আর গোয়োয়ার রাজ্যে এতদ্রূপ বিবাহের প্রতি রাজকর ছিল এবং এক্ষণেও উক্ত বিবাহ ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ প্রবল হইতেছে।...

উক্ত পুনর্ভূর বিবরণ ও তৎপুত্রের দায়াধিকার প্রকরণ এবং তৎপোষক বিবিধ যথার্থ ইতিহাস ও শাস্ত্রাদি যাহা প্রদর্শিত হইল তাহা দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরদিগের অবশ্য প্রতীতি হইতে পারে যে উক্ত বিষয় শাস্ত্রামূলক নহে কিন্তু বহুকালপর্য্যন্ত সাধারণে অপ্রচলিত থাকাতে দ্বেষ্য হইয়াছে এবং উক্ত পুনর্ভূবিবাহ পুনঃ স্থাপিত হইলে তৎপুত্রের দায়াধিকারক্রম অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত হইতে পারে। আর এক্ষণে বিধবার পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ থাকাতে যে সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিম্বা তর্ক দ্বারা তাহা বিবরণ অনাবশ্যক যেহেতু এতদ্দেশীয় লোকেরা অনায়াসেই স্বীকার করেন যে অস্ত্রীক পুরুষের পুনর্বিবাহ করণে যাদৃশ ক্ষমতা আছে বিধবার প্রতি তাদৃশ শক্তি অর্পণ করিলে অধিক ক্লেশ ও পাপের দাস হইয়া প্রায় অর্দ্ধাংশ হিন্দুজাতীয়দিগের সুখবৃদ্ধির সম্ভাবনা অতএব উক্ত অনিষ্ট নিবারণার্থে সম্ভ্রান্ত বিজ্ঞ মহাশয়দিগের উদ্যোগী হওয়া উচিত এবং এতদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সচেষ্ট হইলে নিরুদ্যমতারূপ দুর্নাম হইতে মুক্ত হইবেন। [অংশ বিশেষ সা. বা. স. (ঘোষ) ৪। পৃ ৭৭-৭৯]

রচনাটির প্রথম ও শেষ প্যারার গদ্যরীতির তুলনা করলে দেখা যাবে যতিচিহ্ন ব্যবহার না করে বাক্যগঠনের দায়ে লেখককে বাধ্যতই সংযোজক পদের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। তাই দাঁড়ি ব্যবহার সত্ত্বেও বাক্যগঠনের প্রধান প্রবণতা বাঙলাবাচনের দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বাক্যগুলিকে একটি বাক্যের আওতার ভেতর আনা। প্রথম প্যারায় ১১ বার সংযোজক পদ ব্যবহৃত হয়েছে, শেষ প্যারায় ৯ বার। প্রথম ও শেষ দুটি প্যারাতেই মাঝখানে ১ বার করে মাত্র দাঁড়ি পড়েছে। "প্রতিবন্ধকের সরলতায়", "প্রতিবন্ধকের পোষকতায়", "প্রতিবন্ধকে অনাস্থা" — এই ধরণের পদ গঠনের ফলে অর্থের বিনিময়ে বাক্যের ভেতরে এমন এক কৃত্রিম সংহতি এসেছে যার ফলে যতিচিহ্ন ব্যবহারের কোনো অবকাশ থাকছে না। অথচ শেষ প্যারায় সাপেক্ষ সর্বনাম ও অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারের ফলে বাক্য দীর্ঘ হলেও যতিচিহ্ন ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন হচ্ছে না।

কিন্তু রচনাটিতে যতিচিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতার প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্যারায় প্রসঙ্গের নির্দিষ্টতা ও যুক্তির পারম্পর্যের প্রয়োজনে দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়েছে ও লেখক অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যও ব্যবহার করেছেন। দাঁড়ির দ্বারা প্রসঙ্গের চিহ্নিত নির্দিষ্টতার ভেতর অনুপ্রসঙ্গ বা উদাহরণের স্বাতন্ত্র্য বোঝানর জন্য লেখক দুটি জায়গায় সেমিকোলন ব্যবহার করেছেন। এই ব্যবহারের ভেতর একটা পদ্ধতি আছে।

পদ্ধতি আছে কমাচিহ্ন ব্যবহারেও। যেখানে অনেকগুলি নামের উল্লেখ আছে, সেখানে একটি নাম থেকে আর-একটি নামকে আলাদা করতে কমা ব্যবহৃত হয়েছে। কমার এটি একটি প্রয়োজনীয় ব্যবহার। কিন্তু কমা ব্যবহারের ফলে বাক্যের ভেতরে parenthesis, clause ও বিশেষণ ব্যবহারের যে নতুন সুযোগ আসে সে-বিষয়ে কোনো সচেতনতা লক্ষ করা যায় না।

উ ২৩ শ্রাবণ ১৭৬৪ শক [১৮৪২ খৃঃ অঃ] বিদ্যাদর্পন

স্ত্রীগণ (সপত্নী) এই শব্দের প্রতি যে প্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করে এবং দ্বেষের সহিত নিয়ত তাহার অমঙ্গল চেষ্টা করে, আর পুরুষগণ অন্যের সহিত আপন ভার্য্যার কোন অসদ্ব্যবহার দৃষ্টি করিলে যে রূপ ঈর্ষা ও ঘৃণা অনুভব করিয়া থাকে, তাহাতেই স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, যে পরমেশ্বর মনুষ্যের অন্তঃকরণে এই উপদেশক দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, যে কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয়ের পক্ষে এক স্বামী বা এক দারা সত্ত্বে অন্য বিবাহ করা কদাপি উচিত এবং সুখজনক নহে।

পৃথিবীস্থ অনেক শাস্ত্রেই এক বিষয়ে ঐক্য হয়, এবং যুক্তিও তাহাতে বিলক্ষণ সহায়তা করে, অর্থাৎ ঈশ্বর প্রথমে এক পুরুষ এবং এক স্ত্রী করিয়াছিলেন। যদিস্যাৎ বহু-বিবাহ তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তবে তিনি প্রথম মনুষ্যের হস্তে অধিক ভার্য্যাকে অর্পণ করিয়া অবিলম্বে বংশবৃদ্ধির উপায় প্রদান করিতে পারিতেন। তদ্ভীত চাক্ষুষ প্রমাণ এবং অনুমান দ্বারা অবগত হইতেছি, যে অবনীমধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরি তুল্য সংখ্যা, অতএব যদিস্যাৎ এক মনুষ্য দশ বা দ্বাদশ রমণীকে অধিকার করে, তবে তাহার বিপরীতে দশ বা দ্বাদশ ব্যক্তিকে বিবাহরসে বিঞ্চিত হইতে হয়, যাহা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ।

স্ত্রী গ্রহণ কালীন আমরা মস্তক উপরে এক বৃহৎ ভার ধারণ করি, এবং অসঙ্খ্য কর্ম্মসূত্রে অন্তঃকরণকে বদ্ধ করিয়া থাকি, বিশেষতঃ এই এক উত্তম ব্রত পালন করিতে স্বীকৃত হই, যে আমরা সাধ্যানুসারে আমাদের অর্দ্ধাঙ্গী ভার্য্যাকে আনন্দ বিতরণ করিতে ত্রুটি করিব না। এইরূপ স্ত্রী-ও স্বামীর সুখজন্য সকল চেষ্টাকে নিযুক্ত করিতে অঙ্গীকার করেন। অতএব স্ত্রীর সুখ অন্বেষণ স্বামীর কর্ম্ম, এবং পতির সুখ চিন্তা

> ভার্য্যার প্রেম খর্ব হইয়াছে, কি যে স্থলে স্ত্রীর সংখ্যা একের অধিক। সেস্থলে স্বামীর প্রেম নানা পাত্রে বিভক্ত হইয়া সামান্যত: প্রত্যেকের প্রতি আদরের অল্পতা জন্মায়, এবং পতিও সকলের প্রণয়কে তুল্যরূপে গ্রহণ করিতে অপারগ হয়েন। . . . [সা. বা. স. (ঘোষ) ৪। পৃ ৫৫৭]

শ্রীশিশিরকুমার দাশ-এর যতিচিহ্ন সম্পর্কিত নিবন্ধটি সম্পর্কে মন্তব্যে শ্রীসুকুমার সেন বলেন, 'শিশিরবাবু বলতে চান, দেবেন্দ্রনাথের লেখায় যে ভাষণ-কলা নৈপুণ্য প্রকটিত তা সুষ্ঠু যতিচিহ্ন অবলম্বনেই। . . . প্রথমত, 'সুষ্ঠু" যতিচিহ্ন প্রয়োগ ইতিপূর্বেই অক্ষয়কুমার দত্তের লেখায় দেখা দিয়েছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ছাপা 'ভূগোল' বইটিতে তার প্রমাণ রয়েছে।"

এই 'ভূগোল' বইটি থেকে তিনি একটি উদাহরণ দিয়েছেন,-

> এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়া উপায়াভাবে কিয়ৎকাল অপ্রকটিত ছিল পরে তত্ত্ববোধিনী সভা বিশেষভাবেই সুপ্রসন্ন হইয়া স্বীয় বিত্তব্যয় দ্বারা ইহাকে প্রকাশিত করত যে প্রকারে কৃপা বিতরণ করিলেন, তাহাতে সাহসপূর্ব্বক কহিতে পারি, উক্ত সভার এরূপ না হইলে এই পুস্তক সাধারণ সমীপে কদাচ এরূপে উদিত হইত না অতএব চিত্তমধ্যে এই অতুল উপকারকে যাবজ্জীবন জাগরূক রাখিয়া তাহার কৃপামূল্যে বিক্রীত থাকিলাম। [বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২০ সংখ্যা ৩ ১৩৭০ মাঘ-চৈত্র]।

উক্ত আলোচনায় ঐতিহাসিক কালানুক্রম আর প্রয়োগের সুষ্ঠুতা এই দুইটি উদ্দেশ্যের মধ্যে কিছুটা বিভ্রাট ঘটেছে। কিন্তু অক্ষয়কুমার সম্পাদিত বিদ্যাদর্শন-এর উদ্ধৃতিটি ও 'ভূগোল'-এর এই উদ্ধৃতি একসঙ্গে বিচার করলে অক্ষয়কুমারের যতিব্যবহারের নূতনত্ব স্পষ্ট হয়। এই দুটি উদাহরণে অক্ষয়কুমার দাঁড়িব্যবহারে কিছুটা অনিশ্চিত। সংযোজক পদের দ্বারা দুই বা ততোধিক বাক্যের সংযোজন আর দাঁড়ি চিহ্নকে তিনি যেন পরস্পরবিরোধী ভাবছেন। তেমন ক্ষেত্রে তিনি দাঁড়ি ব্যবহার করেন নি। যদিও ইতিপূর্বেই সংযোজকপদে দাঁড়ি ব্যবহার দেখা যায়। প্রথম উদাহরণের তৃতীয় প্যারায় প্রথম বাক্যে 'পারি'-র পরে দাঁড়িচিহ্ন স্টাইলের দিক থেকেই কিছুটা প্রয়োজনীয় ঠেকে। দ্বিতীয় উদাহরণে'অপ্রকটিত ছিল'-র পরে দাঁড়ি তো প্রায় অপরিহার্য। আসলে অক্ষয়কুমারের এই প্রাথমিক চেষ্টায় দাঁড়ির চাইতে অন্যচিহ্নের ব্যবহারই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম উদাহরণে প্রথমে ব্র্যাকেট দিয়ে উদ্ধৃতি বুঝিয়ে তিনি রচনা শুরু করেন। তারপর রচনায় বাক্যের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যতিচিহ্নকে এক করে দেন। তাই প্রতিটি সমাপিকা ক্রিয়া কোনো না কোনো যতিচিহ্নে, প্রধানত কমায়, চিহ্নিত। প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি উদাহরণ সম্পর্কেই এই কথা বলা চলে। প্রথম উদাহরণটিতে একটি জায়গায় সমাপিকা ক্রিয়া লুপ্ত আছে ('উভয়েরি তুল্য সংখ্যা [হয়])"।

অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় বিদ্যাদর্শনের ছয়টি সংখ্যামাত্র প্রকাশিত হয়। বিদ্যাদর্শনের আরো কিছু উদাহরণ পরীক্ষা করলে পরবর্তী তত্ত্বোবোধিনীর নতুনত্বের সঙ্গে তার তুলনা করা সম্ভব। কিন্তু এই প্রাথমিক সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে একটি সিদ্ধান্ত অন্তত করা যায়। বাংলা গদ্যের উদ্ভবের ইতিহাসই বাংলায় যতিচিহ্ন ব্যবহারের রীতিপ্রতিষ্ঠার পথে সকলের চেয়ে বড় বাধা ছিল। আমাদের গদ্যভাষায় সামাজিক প্রয়োজনে জনসংযোগের দায় থেকে উদ্ভূত গদ্যভাষার যুক্তি-শৃঙ্খলা ও গড়নের ভেতর থেকে যতিচিহ্নের ব্যবহার অনিবার্যভাবে বেরিয়ে আসে নি। যতিচিহ্ন গদ্যের ওতপ্রোত উপকরণ হয়ে না উঠে, গদ্যশৈলীর বিপরীতে চলে যায়। যতিচিহ্ন সম্পর্কে রামমোহন রায়ের ব্যাখ্যা বাংলা গদ্যের সংখ্যাগুরু লেখকদের প্রভাবিত করতে পারে নি তার কারণ সেখানে বিরতির প্রয়োজন ও কি কি ভাবে বিরতি গ্রহণ করতে হয় ব্যাখ্যাত হয়েছে বটে কিন্তু সেই প্রয়োজন ও স্থান নির্ণয়ের কোনো সূত্র নেই, — লেখককে নিজের ব্যক্তিগত বিচারের ওপর নির্ভর করতে হয়। অক্ষয়কুমারই প্রথম বাক্যের গড়নের ভেতর যতিচিহ্নকে নির্দিষ্ট করলেন। এক-একটি ক্রিয়া বাক্যের এক-একটি প্রধান অংশ। এই প্রধান অংশের স্বাতন্ত্র্য এতই স্পষ্ট যে এই অংশ সম্পূর্ণ পৃথক একটি বাক্য হয়ে যেতে পারে বা অন্য এক বা একাধিক বাক্যের সঙ্গে যুক্তও হতে পারে। এই প্রাধান্যকে চিহ্নিত করলে যতিচিহ্নের দ্বারা বাক্যের গড়নটি স্পষ্ট হবে। গড়নটি স্পষ্ট হলে বাক্যের অর্থ পরিষ্কার হবে। সুতরাং একটি সমাপিকা ক্রিয়া — একটি যতিচিহ্ন — প্রধানত এমা।

যতিস্থাপনের স্থান নির্ণয়ের এই পদ্ধতি যতিস্থাপনের রীতির প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক ভিত্তি হিসেবে কার্যকর।

সমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে বাক্যকে প্রধান অংশে ভাগ করার এই রীতির ফলে কোন্ সমাপিকা ক্রিয়াকে 'দাঁড়ি' চিহ্ন দেয়ার জায়গা হিসেবে বেছে নেয়া হবে সে-নিয়ে খানিকটা দ্বিধা ও অনিশ্চয়তা এই প্রাথমিক পর্বে থাকতে পারে। বিশেষত দাঁড়ি যেমন ক্রিয়াসম্পাদনের সঙ্কেত দেয়, তেমনি আবার একটি প্রসঙ্গ শেষ হওয়ারও সঙ্কেত দিতে পারে। প্রসঙ্গান্তরের চিহ্ন হিসেবে দাঁড়ির যে-ব্যবহার চলে আসছিল অক্ষয়কুমার তাঁর রচনার প্রাথমিক পর্বে দাঁড়ি ব্যবহারে প্রধানত তাই অনুসরণ করেছেন।

উ ২৪ আষাঢ় ১৭৬৪ শক বিদ্যাদর্শন

এদেশীয় পুরুষেরা সম্পূর্ণ বিদ্যাধিকারী, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা যে কি জন্য তাহাতে বঞ্চিত তাহার কোন কারণ প্রত্যক্ষ হয় না। ভাল, স্ত্রীগণের বিদ্যায় অধিকার যদি পরমেশ্বরের অভিপ্রায় না হইত তবে তিনি পশুদিগের জড়বুদ্ধির ন্যায় তাহারদিগের বুদ্ধিরও একপ্রকার নির্দিষ্ট সীমা নির্ণয় করিয়া দিতেন, যে তাহা উল্লঙ্ঘন

করা অসাধ্য হইত, এবং পশুরা যেরূপ অল্পকালের মধ্যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও আত্মরক্ষার উপায় চিন্তাদি কতকগুলিন প্রয়োজনীয় ভাবের পরিপক্কতা প্রাপ্ত হইলে আর উন্নতির উপযুক্ত হয় না, সেইরূপ স্ত্রীলোকেরাও পশুগণের তুল্য নির্দ্দিষ্ট বুদ্ধি বিশিষ্ট হইলে কিয়দ্দিবসের মধ্যে নিজ স্বভাবের পরিণাম লব্ধ করিয়া যাবৎকাল সমতাবস্থায় থাকিতেন, যাহা প্রত্যক্ষের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ।

উক্ত বিষয় বিস্তারিতরূপে, এবং নিঃসন্দেহের সহিত ব্যাখ্যা করণের জন্য এস্থলে এই বক্তব্য, যে দর্শন ও শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়বোধ, স্মরণ, চিন্তন, ও তুলনাদির বুদ্ধি, শক্তি এবং সুখ, দুঃখ, প্রেম, ঘৃণা, আশা, ক্রোধাদি চিত্তবিকার ইত্যাদি সমুদয় বিদ্যার উপযোগি যে মনের কার্য্য তাহা কি পুরুষ, কি স্ত্রী, উভয় জাতিতেই এ প্রকার সমান রূপে প্রত্যক্ষ হইতেছে, যে উভয়ের পক্ষেই সমূহ জ্ঞানশিক্ষা ব্যতীত এই সংসার মধ্যে কালযাপন করা অসাধ্য । পরমেশ্বর এই সকল জ্ঞান জনক রত্নে পৃথীবস্থ লোকদিগকে ভূষিত করিয়াও কৃপাস্থিরণে, এবং স্ব অভিপ্রায় প্রকাশে ক্ষান্ত হয়েন নাই । তিনি আমাদিগের মধ্যে যে এক জ্ঞানৈষা, অর্থাৎ জ্ঞানের বাঞ্ছা করিয়া দিয়াছেন যাহার দ্বারা আমরা স্বচেষ্টায় নানপ্রকার বিদ্যাভ্যাসে উৎসাহিত হই, সেই জ্ঞানৈষা স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিতেই সমান । বালিকাদিগের অন্তঃকরণ উপন্যাসাদি শ্রবণে আশ্চর্য্য ব্যগ্রতার সহিত যেন উড্ডীয়মান হইতে থাকে, এবং বক্তা ইতিহাস কথন কালীন হঠাৎ নিস্তব্ধ হইলে উৎকণ্ঠা, এবং ক্ষোভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে । কোন স্ত্রীকে এক প্রহেলিকার প্রশ্ন করিলে তাহার মীমাংসার জন্য তিনি দিবানিশি উৎকণ্ঠিতা রহেন । যাঁহারা কিঞ্চি মাত্র দেশের অবস্থা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন, যে ইদানীং অনেকানেক পরিবারস্থ বিশেষ বিশেষ বিদ্যাশিক্ষার দৃঢ় প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও শুদ্ধ স্বীয় জ্ঞানাভিলাষ প্রযুক্ত স্বয়ং যত্নশীলা হইয়া যথাসাধ্য বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন ।-

. . . [সা. বা. স. (ঘোষ) ৪।পৃ ৫৭৬]

এই অংশটিতে প্রতিটি সমাপিকা ক্রিয়া কমা বা দাঁড়িচিহ্নে চিহ্নিত । এমন কি সেখানে ক্রিয়া উচ্চারিত নয়, সেখানেও যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে — 'যাহা প্রত্যক্ষের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ'' ''এই সংসার মধ্যে কালযাপন করা অসাধ্য '' ''সেই জ্ঞানৈষা স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিতেই সমান' ফলে বাক্যের অন্তর্গত clause গুলি বাক্যের ভেতর প্রয়োজনীয় স্বাতন্ত্র্য পায় । সেই স্বাতন্ত্র্যের ফলে বাক্যের অর্থ পরিষ্কার হয় আর বাক্যের ভেতর এই বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের clause এক বিশেষ ধরণের বাক্যস্পন্দ সঞ্চারিত করে দিতে পারে । দ্বিতীয় প্যারাটিতে 'দর্শন ও শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়বোধ' ''স্মরণ, চিন্তন, ও তুলনাদির বুদ্ধি শক্তি'', 'সুখ, দুঃখ, প্রেম ঘৃণা আশা, ক্রোধাদি চিত্তবিকার — এই তিনটি অংশ এই adjective clause এর কর্তা হিসেবে কাজ করছে । 'ইন্দ্রিয়বোধ' ''বুদ্ধিশক্তি '' 'চিত্তবিকার '' এই তিনটির বিশ্লেষণাত্মক অংশগুলি কমাচিহ্নের দ্বারা লেখক এমনভাবে

আলাদা করেছেন যে পড়ার সময় একটা বাক্যস্পন্দ লক্ষ করা যায়। মনে হয় না যে এই বাক্যস্পন্দ কোনো সচেতন চেষ্টার ফল। কিন্তু বাক্যের গড়নের সঙ্গে যতিব্যবহারকে যুক্ত করতে পারলে এই বাক্যস্পন্দ খুব স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। অক্ষয়কুমারের গদ্যে সচেতন যতিব্যবহারের এই ফল ফলতে শুরু করেছিল।

অংশটিতে দ্বিতীয় প্যারায় দাঁড়ি ব্যবহার একই সঙ্গে প্রসঙ্গনির্দেশ করছে আবার প্রসঙ্গের ভেতরের অনুপ্রসঙ্গও নির্দেশ করছে। কিন্তু প্রথম প্যারায় দ্বিতীয় দাঁড়িটি মাঝখানে "এবং" এই সংযোজক অব্যয়ের ফলে বিলম্বিত হয়েছে। কিন্তু প্রথম বাক্যটি অনেক ছোট হল ও দ্বিতীয় বাক্যটি "ভাল" এই কথা বলার ভঙ্গিতে শুরু হওয়াতে বাক্যের এই দীর্ঘতা গদ্যের প্রবহমানতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না।

অংশটিতে ক্রিয়া বাদ দিয়েও কতকগুলি জায়গাতে কমা চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। তার প্রধান উদ্দেশ্য বহুকর্তাবিশিষ্ট বাক্যের কর্তাগুলিকে বা অন্যত্র প্রসঙ্গত আসা বহু নামপদকে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র রাখা।

উ ২৫ কার্তিক ১৭৬৪ শক। বিদ্যাদর্শন

এই পত্রপ্রেরিকা বেশ্যা বা অন্য যে কোন ব্যক্তি হউন, তাহাতে আমারদিগের কোন আপত্তি নাই। আমরা ব্যক্তির প্রতি লক্ষ করি না তাহার যুক্তি এবং অভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখি। মনোযোগের সহিত এই পত্র পাঠ করিলে বিবেচক মনুষ্য দেশের নানা কুপ্রথা এবং তাহার দেদীপ্যমান ঘৃণিত ফল একত্র সন্দর্শন করিতে পারিবেন।

আমরা পূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছি যে এদেশে কৌলীন্য প্রথার সমাদর থাকাতে অশেষ প্রকার কুকর্মের ঘটনা হইতেছে। এইক্ষণে দেশীয় ব্যক্তিগণ তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করুন, যাঁহারা স্বয়ং দুষ্কর্মের আলোচনা করেন, তাঁহারদিগের চেতনা হইয়াছে তাঁহারাই সাধারণ সমাজের উপদেশ জন্য আপন দোষ পর্যন্তও বিজ্ঞাপন করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন, অতএব এরূপ সুযোগের সময়ে আমরা একান্ত অন্তঃকরণে গভর্ণমেন্টের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এবং দেশস্থ মনুষ্যবর্গকে অনুরোধ করিতেছি, যে তাহারা বহুবিবাহের নিবৃত্তি জন্য দৃঢ় চেষ্টা করুন, আমরাও তাঁহারদিগের অগ্র হইতে প্রস্তুত আছি।।

অপর পত্রপ্রেরিকা যে স্বামীর সহিত মনের অনৈক্য এই শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করা আবশ্যক। দম্পতি কলহের নানাকারণ মধ্যে এক বিষয় অতি স্পষ্টভাবে আমারদিগের প্রত্যক্ষ হইতেছে। এদেশের এক কুরীতি আছে যে দম্পতি পরস্পর আপন ইচ্ছাক্রমে স্বামি বা স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারেন না। পিতা বা মাতা, বা ভ্রাতা ইত্যাদি ব্যক্তি বিবাহের পাত্র বা পাত্রী নিশ্চয় করেন, এবং সেই নির্ণয়ানুসারে

পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হয় । কিন্তু ইহার অপেক্ষা আর আশ্চর্যের প্রথা কি আছে ? যাহার সহিত চিরকাল এক শরীরের ন্যায় সংযুক্ত রহিতে হয়, যাহার গুণের প্রতি জীবনের অধিক সুখ নির্ভর করে, যাহার চরিত্র কিঞ্চিৎমাত্র দোষান্বিত হইলে সংসারের সমুদয় আনন্দ একেবারে বিষাক্ত হয় যে ব্যক্তি সকল পরামর্শ এবং সকল পরামর্শ এবং সকল যুক্তির অধিকারী এবং যাহার নিকটেই প্রত্যেক বিষয় গোপনের অযোগ্য, এবম্প্রকার স্ত্রী বা স্বামি গ্রহণের ভার যে পরের প্রতি অর্পণ হয়, ইহা কি আক্ষেপের বিষয় । আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি ইহাতেই দম্পতিকলহের বীজস্বরূপ হয় । [সা. বা. স. (ঘোষ) ৩।পৃ ৫৭২-৭৩]

এই অংশটিতে দাঁড়ির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বেশি ও সমাপিকা ক্রিয়াযুক্তেই কমা-র দ্বারা চিহ্নিত নয়, ফলে কমা-র ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম ।

প্রথম ও তৃতীয় প্যারায় লক্ষ করা যায়, 'যে' এই সাপেক্ষ সর্বনামের ওপর নির্ভরশীল বাক্যকে সবসময় কমা দ্বারা চিহ্নিত করা হয় নি । এর ফলেঅবশ্য উপান্ত্য বাক্যটিতে একটি জায়গায় এই কমা ব্যবহার না করাটা বাক্যটির পক্ষে ক্ষতিকারক ।

কিন্তু দ্বিতীয় প্যারাটিতে একটি জটিল সংক্ষিপ্ত বাক্যের পর লেখক একটি দীর্ঘ বাক্যের শেষে, একটিমাত্র দাঁড়ি ব্যবহার করেছেন । এই দীর্ঘ বাক্যটিতে 'অতএব'-এর আগে একটি দাঁড়ি প্রত্যাশিত ছিল । কিন্তু লেখক বাক্যটিকে এমন এক সম্বোধনের ভঙ্গিতে শুরু করেন যে একেবারে শেষ পর্যন্ত বলাটা যেন তাঁর পক্ষে আবশ্যিক হয়ে ওঠে । অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রে বাক্যের গড়ন ও ন্যায়ের চাইতে সম্বোধনের কণ্ঠভঙ্গিই যতিস্থাপনকে নিয়ন্ত্রন করছে ।

একজন কোন রমণী সম্পাদককে একটি চিঠি লেখায় সম্পাদক সেই চিঠির সূত্রে তাঁর বক্তব্য প্রতিপাদনে এতটাই ব্যগ্র হয়ে ওঠেন যে তাঁর কাছে বাক্যের শৃঙ্খলার চাইতে আবেগের' প্রকাশ্য প্রাধান্য পায় । সেই কারণেই এই বাক্যটি দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও ও এর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন গড়নের বাক্যাংশ থাকলেও লেখকের আবেগের সংক্রমণ ঘটায় বাক্যটি গদ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রবহমানতায় চলিষ্ণু হয়ে ওঠে । অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রে লেখকের আবেগসঙ্গতিও যতিস্থাপনকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করছে । তৃতীয় প্যারার উপান্ত্য বাক্যটিও এই আবেগনিয়ন্ত্রিত বাক্যের উদাহরণ । ফলে ঐ দীর্ঘ বাক্যের পর একেবারে শেষে ঐ-রকম একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য রচনাটির ভেতর নাটকীয়তা এনে দেয় ।

উ ২৬ ভাদ্র ১৭৬৪ শক । বিদ্যাদর্শন

রাজা রামমোহন রায় অতি উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মন বংশে উদ্ভব হইয়াছিলেন তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বঙ্গলরাজার অধীনে অতিশয় মর্য্যাদাবান কর্ম্মে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতামহ মুরশীদাবাদের রাজসভায় অনেক সম্ভ্রান্ত পদ ধারণ করিয়াছিলেন । তাঁহার শেষাবস্থায় কিঞ্চিৎ মানের ত্রুটি হওয়াতে তৎপুত্র রামকান্ত রায় জেলা বর্দ্ধমানের অন্ত:পাতি রাধানগরে আসিয়া বসতি করিলেন । এইখানে আমারদিগের দেশোজ্জ্বলকারী রামমোহন রায় বাংলা ১১৮৭ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।

তিনি সাধারণ রীত্যনুসারে বঙ্গভাষায় উপদেশ প্রাপ্ত হইলে, আপন পিতার অভিলাষ ও পিতৃব্যাদির কৌশলদ্বারা পারস্যভাষা অভ্যাস করণের নিমিত্তে পাটনায় স্থাপিত হয়েন; যেহেতু তৎকালে কথিত ভাষার নিপুণতা ব্যতীত এদেশে রাজকীয় কর্ম্ম লব্ধ হইত না । তার মাতামহ কুলের রীতিক্রমে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা ও হিন্দুদিগের বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুশীলন করিতে অভিরত হইলেন ।

বাল্যকালে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মে অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, এবং তাঁহাতে তাঁহার এ প্রকার দৃঢ় বিশ্বাস ও অচলাভক্তি ছিল, প্রতি দিবস শ্রীমদ্ভাগবতের এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না । কিন্তু রামমোহন রায়ের প্রবল, সুতীক্ষ্ণ এবং ধারণাবতীবুদ্ধি অবিলম্বে পূর্ব্ব সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া সকল বিষয়ের সদসদ্বিচার আরম্ভ করিল, বিশেষত: আরব ভাষায় ইউক্লিড ও এরিষ্টটল নাম দুই পন্ডিতের গ্রন্থ পাঠ দ্বারা অধিকতর পরিষ্কৃত এবং যেন আলোকপ্রাপ্ত হইল ।

তৎকালে যদিও তাঁহার বয়:ক্রম অত্যল্প, তথাপি তিনি আপন ধর্ম্মের সত্যাসত্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এবং দৃষ্টি করিলেন যে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে, এবং ভ্রমের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে । তিনি কহেন যে 'আমি যখন ষোড়শ বৎসর বয়স্ক, তখন হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরোধে এক হস্তলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলাম । এই লিপি এবং অস্মদভিপ্রায় অনেকের নিকট প্রকাশ হওয়াতে প্রিয়তম আত্মীয় ব্যক্তির সহিত আমার কিঞ্চিৎ ভাবের অন্যথা হইল, অতএব আমি ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম ।" - [সা. বা. স. (ঘোষ) ৩ । পৃ ৫৬০]

পূর্ববর্তী উদাহরণগুলির ভেতর দিয়ে যতিব্যবহারের ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের কতকগুলি প্রবণতা স্পষ্ট হয় । তিনি সমাপিকা ক্রিয়াকে বাক্যের একএকটি ইউনিট ধরে কমা চিহ্ন দিয়েছেন, প্রথমদিকে দাঁড়িব্যবহারে তাঁর কিছুটা অনিশ্চয়তা ছিল, আবার সমাপিকা ক্রিয়া - অতিরিক্ত কমাও তিনি যথেষ্ট

ব্যবহার করেন ও সমাপিকা ক্রিয়া হলেই যতি ব্যবহার করতে হবে এই রীতিরও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটান। তাঁর বাক্যগঠনে কণ্ঠস্বরের ভঙ্গি লক্ষ করা যায়। সেই ভঙ্গি যতিবিন্যাসকে প্রভাবিত করেছে আবার কোথাও তিনি বিষয়ের সঙ্গে আবেগ-সংহতি লাভ করেন — সেখানে সেই আবেগ-সংহতি যতিব্যবহারকে প্রভাবিত করে।

আলোচ্য অংশটিকে এই প্রবণতাগুলির সমন্বয়ের উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। অংশটিতে মাত্র ৭ বার অসমাপিকাক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে — হওয়াতে, আসিয়া, হইলে, করিতে, করিয়া, হইয়া, হওয়াতে। এর ভেতর মাত্র প্রথম দুইটি অসমাপিকা একটি বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে। আর কোনো বাক্যে দুটি অসমাপিকা ক্রিয়া নেই। ফলে বাক্যগুলির গড়ন অপেক্ষাকৃত সরল।

যতিচিহ্নের ব্যবহারে বাক্যের অন্তর্গত unit চিহ্নিত হয়ে যায় বলে বাক্য এই গড়নের সরলতা পেতে পারে। এই সরল গড়ন আবার বাক্যে দাঁড়িচিহ্নের ব্যবহারও অনেক সহজ করে ফেলে। মাত্র এইটুকু একটি রচনাংশও ৪টি প্যারায় বিভক্ত। প্রথম প্যারায় দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়েছে ৩ বার, দ্বিতীয় প্যারায় ২ বার, তৃতীয় প্যারায় ২ বার, চতুর্থ প্যারায় ৩ বার। রচনাটিতে দ্বিতীয় প্যারায় ১ বার ও চতুর্থ প্যারায় ১ বার সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়েছে — উভয়ক্ষেত্রেই হেতুর্থক clause পরে আসায়। কমা প্রায় সর্বত্রই ক্রিয়া নির্ভর — 'যে' সর্বনামের পর কমা ব্যবহার করা হয় নি।

মাত্র ছয়-সংখ্যা-স্থায়ী বিদ্যাদর্শনের পাতাতেই অক্ষয়কুমার বাংলার সংবাদসাময়িকপত্রের গদ্যের যতিচিহ্নব্যবহারের একটি গ্রহণযোগ্য রীতি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। অসমাপিকা ক্রিয়া সাপেক্ষ সর্বনাম ও সংযোজক অব্যয়ের সঙ্গে কমার ব্যবহার অক্ষয়কুমারই সংশোধন পরিহার করেছিলেন আবার সংশোধন রক্ষাও করেছিলেন। বস্তুত এই ব্যবহার ও পরিহার গদ্যরচনার ভেতরের ছন্দ ও গড়নের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অক্ষয়কুমার যতিব্যবহারকে গদ্যের গড়নের একটি উপাদানে পরিণত করেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গদ্যে তাই যতিচিহ্ন বাইরের একটি উপকরণের মতো বিশ্লেষণযোগ্য নয়, গদ্যের স্টাইলেরই একটি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ নির্দেশক। প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ফলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গদ্যরীতি ও তারই অন্তর্গত যতিব্যবহাররীতি বাংলা সাময়িক সংবাদ/পত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। প্রথমে বিদ্যাদর্শন পত্রিকার ও পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে অক্ষয়কুমারই সেই প্রভাবের প্রধান উৎসস্থল। তাই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গদ্য ও যতিস্থাপন রীতি বস্তুত বিদ্যাদর্শনে অক্ষয়কুমার যে-চর্চার সূত্রপাত করেন, তারই সম্প্রসারণ। যদিও তত্ত্ববোধিনীতে বিষয়ের বৈচিত্র্য গদ্যশৈলীরও বৈচিত্র্য ঘটিয়েছে। যতিবিন্যাস রীতির বৈচিত্র্য গদ্যশৈলীর বৈচিত্র্যের অঙ্গীভূত

উ ২৭. ১ শ্রাবণ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৬৮ শক (১৮৪৬ খৃঃ অঃ)

বালুময় উত্তপ্ত মরুভূমি ভ্রমণপূর্ব্বক ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সম্মুখে কোন নিবিড় কানন দৃষ্টি করিলে মনে অত্যন্ত আহ্লাদ জন্মে ; কিন্তু তাহাতে প্রবেশ করিয়া যদি কেবল কন্টকপূর্ণ লীন নিষ্ফল কন্টকি বৃক্ষ এবং শুষ্ক অথবা পঙ্ক পূরিত সরোবর দেখা যায়, তবে কি প্রকার নিরাশ হইতে হয় । তদ্রূপ কোন গ্রামবাসী স্বদেশের হিতৈষী বিজ্ঞ ও সুচরিত্র ব্যক্তি সমুদয় পল্লীগ্রামের বিষম দুরবস্থা জন্য বিষন্ন হইয়া, কলিকাতার বাহ্য শোভা এবং তত্রস্থ লোকের নানা হিতজনক বিষয়ে মৌখিক আন্দোলন অবগতিপূর্ব্বক অতিশয় আনন্দিত হয়েন, কিন্তু তাহারদিগের আচার, ব্যবহার, চরিত্র বিষয়ে যত নিগূঢ়রূপে অনুসন্ধান করেন, ক্রমশঃ ততই ক্ষুব্ধ হইতে থাকেন । বৃদ্ধ যুবা বালক, ধনী মধ্যবর্ত্তী দরিদ্র, ইহারদিগের মধ্যে কাহারও প্রতি দৃষ্টি করিয়া তিনি পরিতোষ প্রাপ্ত হয়েন না । - [স. বা. স. ২ (ঘোষ) পৃ ১৭)

অংশটিতে কোথায় কোথায় চিহ্ন দেয়া হয়নি তার কতকগুলি বিশেষ স্থান আছে । কোনো কোনো অসমাপিকায় কমা দেয়া হয়নি । কিন্তু যেখানে প্রসঙ্গান্তর ঘটেছে, দ্বিতীয় বাক্যে, সেখানে দেয়া হয়েছে । বিশেষণগুলিকে কমাচিহ্নিত করা হয়নি কিন্তু শেষ বাক্যে তাদের একএকটি গুচ্ছকে করা হয়েছে । অব্যয় কর্ত্তৃক সংযুক্ত দুইটি বাক্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা আছে । তাই প্রথম বাক্যে সেমিকোলন ও 'কিন্তু' একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে । বিস্ময় চিহ্ন ব্যবহারের ফলে রচনার ভেতর কণ্ঠস্বরের প্রবেশ ঘটে ।

এর পরের প্যারাটিতে বাক্যের গড়ন পালটায় ও সঙ্গে সঙ্গে যতিচিহ্নের ব্যবহারও ।

এইক্ষণকার প্রাচীন লোক এবং প্রাচীনদিগের সম্পূর্ণ মতানুগামি যাঁহারা, - বিষয়োপযোগী হস্তলিপি এবং কিঞ্চিৎ অঙ্কপাত মাত্র যাঁহারদিগের বিদ্যার সীমা, এবং যাঁহারদিগের এই প্রত্যয় যে কেবল অর্থ উপার্জ্জনই সমুদয় বিদ্যার তাৎপর্য্য ও তাবৎ জীবনের সুখ — স্বদেশের মঙ্গলামঙ্গল তাঁহারা চিন্তাই করেন না — "দেশের উপকার" এ বাক্যের অর্থও তাঁহাদিগের সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় না । তাঁহারা কেবল স্বার্থের প্রতিই দৃষ্টি রাখেন — এই সীমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া এক পাদও অগ্রসর হয়েন না — সৎ বা অসৎ যে উপায় দ্বারা হউক ধনসঞ্চয় করিয়া তাহা পুত্র-পৌত্রাদির নিমিত্তে রক্ষা করিতে পারিলেই আপনারদিগকে কৃতকার্য্য বোধ করেন । ইহার জন্যই দিবারাত্রি ব্যতিব্যস্ত, এ কর্ম্মের সমাধা পরে যে কিঞ্চিৎকাল অবশিষ্ট থাকে, তাহা প্রায় অলীক আমোদেই ক্ষেপণ করেন । ইহাঁরদিগের মধ্যে যাঁহারা আপনারদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা বাল্যক্রীড়ার ন্যায় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন । বিষয় সম্পত্তি লাভের আশ্বাসের সহিত আমোদ-সম্ভোগ এবং সুখ্যাতির আকাঙ্ক্ষা তাঁহারদিগের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রধান সূত্র, নতুবা প্রতিমা অর্চ্চনাতে নৃত্য, গীত, গৃহসজ্জা প্রভৃতির

জন্যই বিশেষ মনোযোগি হইয়া প্রচুর অর্থব্যয় অনেকে কেন করেন? ... [ঐ]

অংশটিতে ৬টি কমার ভেতর শেষ ২টি ব্যবহৃত হয়েছে একই প্রসঙ্গে উল্লেখিত শব্দগুলির পার্থক্য বোঝাতে, মাঝখানে ২টি ব্যবহৃত হয়েছে অপেক্ষাকৃত ছোট বাক্যের clause নির্দেশে। কিন্তু প্রথম ২টি ব্যবহৃত হয়েছে যথাক্রমে ড্যাস ও 'এবং' - এর সঙ্গে — আধুনিক বিচারে এই দুটি ব্যবহারই অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু এই অংশটির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ড্যাস দিয়ে বাক্যের অন্তর্গত দীর্ঘ clause কে পৃথক করে বাক্যের ভেতর সংহতি আনা। এই সংহতি স্বভাবতই কোনো রীতির অন্ধ অনুসরণে আসে না। তাই প্রসঙ্গনির্দেশের নিরিখে এই প্যারার দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যেরই অন্তর্গত। কিন্তু বাংলা গদ্যের নিজস্ব ধরনটাই-এ সাপেক্ষ সর্বনামের 'যাঁহারা' একবার উচ্চারিত হলে তার ওপর নির্ভরশীল 'তাঁহারা' দিয়ে নতুন বাক্যও রচিত হতে পারে। এই অংশটির প্রথম বাক্যে যতিস্থাপন রীতিকে যেমন অত্যন্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে অনুসরণ করা হয়েছে, দ্বিতীয় বাক্যটিতে তেমনি আবার খানিকটা স্বাধীনতাও নেয়া হয়েছে। ঠিক তেমনি স্বাধীনতাই নেয়া হয়েছে শেষ বাক্যটিতে, 'তাঁহারদিগের' পদটির উপাধি-নির্দেশ আছে তার পূর্ববর্তী বাক্যে। যতি ব্যবহারের এই স্বাধীনতা আসলে বাংলা গদ্যেরই সাবালকতার প্রমাণ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একটি প্রধান অংশ ছিল তত্ত্ববোধিনী সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার অনুলিখন লিখে বক্তৃতা দেয়া আর বক্তৃতার অনুলিখনের ভেতর স্টাইলের গুরুতর পার্থক্য ঘটে। লিখিত বক্তৃতা স্টাইলগতভাবে লিখিত রচনাই কিন্তু বক্তৃতার অনুলিখন স্টাইলের দিক থেকে মানুষের কথা বলার অনেকটা কাছাকাছি যায়। যদিও ধরেই নেয়া যায় যে সেই সময় বক্তৃতা যখন লেখা হত তখন সেটি লিখিত প্রবন্ধের শৃঙ্খলাতেই বাঁধা হত, কিন্তু বিশেষত বাক্যগঠনে ও যতিবিন্যাসে বাচনের ভঙ্গি কি থাকতেও পারে।

উ ২৮. তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা। ১ বৈশাখ ১৭৬৬ শক (১৮৪৪ খৃঃ অঃ)

যথাসাধ্য পরস্পর উপকার কর্তব্য, যেহেতু পরস্পর সাহায্যব্যতীত কোন কর্ম নিষ্পন্ন হয় না। এই সামান্য বস্ত্র যাহা আমরা প্রত্যহ পরিধান করি বিবিধ সহকারী বন্ধুগণ কর্তৃক কৃত না হইলে প্রাপ্ত হইতাম না। তন্তুকারকেরা কৃষিকর্ম দ্বারা উৎপন্ন কার্পাস হইতে যন্ত্রদ্বারা তন্তু নির্মাণ করে, বস্ত্র নির্মাণ কারকেরা সেই তন্তু দ্বারা বিবিধ যত্নে বস্ত্র প্রস্তুত করে। এইরূপ সাহায্য দ্বারা ক্রমে ক্রমে সকল আহার্য্য ব্যবহার্য দ্রব্য আমরা প্রাপ্ত হই। এই পরস্পর সাহায্য শক্তি পরমেশ্বর কেবল মনুষ্যদিগকেই দিয়াছেন, এমন নহে; পশু পক্ষি কীট পতঙ্গ প্রভৃতি চেতনাচেতন সকল বস্তুতেই পরস্পর সাহায্য করিবার যোগ্যতা দিয়াছেন। এই পরস্পর সাহায্য শক্তি না থাকিলে পৃথিবীর কোন কর্মই সম্পন্ন হইত না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মধুমক্ষিকারা পরস্পর সহকারে (যে) অত্যাশ্চর্য্য গৃহ নির্মাণ করে তাহা কোন প্রকারে একটি মধুমক্ষিকা দ্বারা সম্পন্ন

হইতে পারে না। এই সমুদয় সৃষ্টির প্রত্যেক পরমাণু পরস্পর আকর্ষণ দ্বারা (যদ্রূপ) পরস্পরকে আশ্রয় দিতেছে তাহা না দিলে কোন প্রকারে সৃষ্টি রক্ষা হইতে পারে না। [সা. বা. স. ২(ঘোষ) পৃ ৮৪]

উ. ২১. ১। আশ্বিন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৬৬ শক, (১৮৪৪ খৃ: অ:)

বাণিজ্য দ্বারা লোকের (যাহা) উপকার হইতেছে, তাহা এই সভার মধ্যে কে না জ্ঞাত আছেন ? বণিকেরা নানা পরিশ্রমে বিবিধ দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব নির্ণয় করিয়া (তত্বৎ) অভাব মোচনার্থে বিবিধ প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিতে সাধ্যমতো যত্নযুক্ত হইতেছেন; ইহাতে তাঁহারা স্বদেশের এবং বিদেশের উপকার একেবারেই করিতে সমর্থ হইতেছেন। প্রচুর শস্যফলাদি এবং বিবিধ বস্ত্র ভূষণাদি জন্য স্বদেশীয় কৃষি এবং শিল্পকারি প্রভৃতিকে সর্ব্বদা প্রতিপালন এবং সেই সকল শস্য ফলাদি এবং বস্ত্র ভূষণাদি দেশদেশান্তরে উপযুক্ত মত বিতরণ করিয়া সর্ব্বসাধারণের সুখবৃদ্ধি করিতেছেন। এই বণিকদিগের প্রসাদে যাহা যাহা সমুদ্র পারে (যে) সকল উপাদেয় দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহা আমরা এই এক্স্থানে বসিয়া প্রাপ্ত হইতেছি। এই (যে) সময়ে আমি বক্তৃতা করিতেছি, এই সময়েও কত দেশের কত বণিক্ আমারদিগের সুখ প্রদান নিমিত্ত ব্যস্ত হইতেছেন।

এই বণিকেরা সকলেই কি কেবল আমারদিগেরসুখ চেষ্টা করিয়া বাণিজ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে ? সমস্ত নাবিকেরাই কি আমারদিগের মঙ্গল ইচ্ছা করিয়া সমুদ্র তরঙ্গকে তুচ্ছ করিতেছে ? ইহা কখনো সম্ভব নহে। প্রায় সমস্ত মনুষ্যই আপন আপন ধন, মান, যশ: প্রভৃতি বৃদ্ধির আশায় পরিশ্রম করিতেছে। অধিকাংশ লোক কেবল ধনাদি সঞ্চয় কর্ম্মে এতাদৃশ ব্যগ্র, (যে) তাহারদিগের দ্বারা জনসাধারণের উপকার বা অপকার হইতেছে, ইহা তাহারা জানিবারও অবকাশ পায় না। পৃথিবীর মধ্যে অতি অল্প লোক আছেন, (যাঁহারা) কেবল সাধারণের উপকার ইচ্ছা করিয়া সকল কর্ম্ম সমাধা করেন। এই সাধারণের মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিরাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসক, এবং ইঁহারাই ধন্য।

(যে) ব্যক্তির কর্ম্ম দ্বারা এমত প্রকাশ পায় (যে) আমারদিগের সুখের নিমিত্তে তাঁহার ইচ্ছা আছে, সেই ব্যক্তির সহিতই আমারদিগের প্রীতি হয়, তদ্ব্যতীত তাহার অন্য মানস থাকিলে তাহার সহিত প্রীতি হওয়া অসম্ভব। এতন্নিমিত্তে কোন আত্মীয় ভবনে আহূত হইয়া তাঁহার বেতনভোগি গায়কবাদকদিগের গীতবাদ্য শ্রবণে সেই গায়কবাদকদিগের সহিত সংপ্রীতি হয় না, তাঁহারদিগের নিকটে বাধ্যও থাকি না, (কারণ) তাহারা আমারদিগের

সুখেচ্ছা না করিয়া কেবল ধনাগমে গীতবাদ্য করে, কিন্তু প্রীতি সেই বন্ধুর সহিতই হয়, (যিনি) আমারদিগের সুখেচ্ছা করিয়া পরিশ্রম দ্বারা সেই গায়ক-বাদকদিগকে আনয়ন করিয়াছেন, এবং তাঁহার নিকটই বাধ্য থাকি। এই প্রকার (যাঁহারা) কেবল পরোপকার জন্য পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহারা সকলেরি প্রিয় সর্ব্বদা ধন্যবাদের যোগ্য হয়েন। (যে) ব্যক্তিরা কেবল ধনোপার্জ্জনে তৎপর, পৃথিবীর উপকার নিমিত্ত কদাচও চিন্তা করে না, তাহারা আমারদিগের প্রিয়পাত্র এবং ধন্যবাদের যোগ্য কি প্রকারে হইতে পারে ? [সা. বা. স. ২। (ঘোষ) পৃ ৮৫]

দুটি বক্তৃতার ভাষাতেই স্টাইলের এমন বৈশিষ্ট্য আছে, যা লিখিত রচনা থেকে এদের আলাদা করে। বাক্যগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। অধিকাংশ যুক্তিই তুলনার দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু সেই তুলনা বা যুক্তিতাকে নির্দিষ্ট প্রসঙ্গের বাইরে সম্প্রসারিত করা হয় নি। বাক্যগুলি এমনভাবে গঠিত যে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়ার স্বাভাবিক গতিতে এগুলি উচ্চারিত হতে পারে। ফলে ঘনঘন দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে বাক্যগঠন ও যতিস্থাপন পরস্পর নির্ভরশীল। তুলনামূলকভাবে অন্য যতিচিহ্নের ব্যবহার কম (প্রথম উদাহরণে ১টি কমা ও ১টি সেমিকোলন, দ্বিতীয় উদাহরণে ১৩টি কমা ও ১টি সেমিকোলন), দাঁড়ির সমতুল্য প্রায়চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণের শেষ প্যারাটিতে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ একটি বাক্য আছে। কিন্তু বাক্যটির ভেতর 'কিন্তু' শব্দটির আগে দাঁড়ি দিয়ে বাক্যটিকে ভাগ করার সুযোগ থাকলেও লেখক সেখানে দাঁড়ি দেন নি। না দেয়া সত্ত্বেও প্রতিটি ক্রিয়াকে কমাচিহ্নিত করে দাঁড়িতে পৌঁছনে বাক্যের জটিলতার চাইতে ছোট বাক্যের পর ছোট-বাক্য উচ্চারণে কণ্ঠস্বরের প্রবাহ ও প্রসঙ্গের ধারাবাহিকতা প্রকাশ পায়।

দুটি উদাহরণেই হেতুবোধক বা সাপেক্ষ সর্বনামকে আশ্রয় করে বাক্যগুলি নির্মিত হয়েছে। প্রথম উদাহরণে মোট ৮টি বাক্যের ভেতর ৫টি বাক্যই এ-রকম; দ্বিতীয় উদাহরণে এই সংখ্যা ১৪টির ভেতর ১০টি। কিন্তু দ্বিতীয় উদাহরণের শেষ প্যারা বাদ দিলে সর্বত্রই একটি যাত্র/সাপেক্ষ পদের ওপর ক্রিয়া নির্ভরশীল। এটা বাংলাগদ্যের তখনকার নতুন রীতি। এরকমে যে বা হেতু যাই থাকুক বাক্যটি শেষ হয়ে গিয়ে দাঁড়িতে। এইভাবে বক্তৃতার বাক্য unit লেখারও unit হয়ে ওঠে। এই unit কে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় দাঁড়ি বা সমতুল্য চিহ্ন দিয়ে।

শ্রীশিবকুমার দাস তাঁর উল্লেখিত প্রবন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষণ তাঁর গদ্যের যতিবিন্যাসকে প্রভাবিত করেছিল কি না। শ্রীসুকুমার সেন এই প্রশ্নটিকে একেবারেই নাকচ করেছেন।

বাংলা সংবাদসাময়িক পত্রের সাক্ষ্যে এ-কথা বলা চলে না যে নির্দিষ্টভাবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাতেই এই ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় যে — রচনাগুলি "বক্তৃতা" বলে উল্লেখিত, তার stylistic গড়ন অন্য রচনাগুলি থেকে আলাদা। এই পার্থক্য ধরা পড়ে যতিচিহ্নের ব্যবহারে। সুতরাং ভাষণের বাচন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক বিশেষ ধরণের রচনার যতিচিহ্নকে নিশ্চয়ই প্রভাবিত করেছিল।

যতিব্যবহারের অনভ্যাস

আট

সংবাদসাময়িকপত্রে বাংলা গদ্যভাষার নিজস্ব রীতি নানা প্রয়াসের ভেতর দিয়ে একটা নির্দিষ্ট আকার পাচ্ছিল। বাংলাগদ্যের এই নিজস্বতা আবিষ্কারের প্রয়াস আর গদ্যে যতিচিহ্ন ব্যবহারের চেষ্টা একদিক থেকে একটিই চেষ্টা, আর - একদিক থেকে দুই স্বতন্ত্র চেষ্টা — অবশেষে একত্রিত।

গদ্যচর্চা আর যতিচিহ্ন ব্যবহার তো গদ্যভাষার মানসিক বিবর্তনে স্বতন্ত্র হওয়া সম্ভব নয় আর যতদিন এই দুই চেষ্টায় স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে ততদিন গদ্য তার সংহতি খুঁজে পায় না।

বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে চেষ্টার এই স্বাতন্ত্র্যই দীর্ঘদিন ধরে চলে এসেছে। ইংরেজি-সংস্কৃত আদর্শের দ্বন্দ্বই চেষ্টার এই স্বাতন্ত্র্যের কারণ। আদর্শের ক্ষেত্রে এই ফাঁক ছিল বলেই সাধু ভাষার নামে এক কৃত্রিম অবাস্তব ভাষা সাহিত্যিক গদ্যের চেহারা নিয়েছে। শিল্প-বাণিজ্য সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র হিসেবে কলকাতা বাংলা ও ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হলেও সেই কলকাতার ভাষা তার শব্দভান্ডার ও বাচন নিয়ে আমাদের নতুন গদ্যভাষার পরিপূর্ণ আদর্শ হয়ে উঠতে পারল না। তাই গদ্যের উপকরণ বিন্যাসেই ব্যয়িত হয়ে গেল উনিশ শতকের প্রথম ৫০।৬০ বৎসর।

যতিব্যবহার তো গদ্যের ইতিহাসেরই ওতপ্রোত। তাই গদ্যে সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার, অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার, সমাপিকার সাহায্যেও বাক্যের clause তৈরি করা, সাপেক্ষ বাক্য সত্ত্বেও বাক্যগঠনের সরলতা আবার একবর্তৃক বাক্যেও বাক্যের জটিলতা, হেতুর্থক clause এর সঙ্গে বাক্যের মূল অংশের সঙ্গতি, সংযোজক অব্যয় ও পদের ব্যবহার, বাক্যের সম্পূর্ণতার সীমা কি ব্যাকরণের দ্বারা নির্ধারিত ও যতিচিহ্নের দ্বারা সংকেতিত নাকি প্রসঙ্গের সম্পূর্ণতার দ্বারা যতিচিহ্ন-নিরপেক্ষভাবে নির্ধারিত — গদ্যের এই সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়ির ব্যবহারে পরিবর্তন, দাঁড়ির বিকল্প সন্ধান, কমা-সেমিকোলন-ড্যাস ব্যবহারের স্থান সন্ধান চলেছে। সেই সন্ধান প্রথম দিকে অধিকাংশ সময়ই ঘটছে স্বতন্ত্রভাবে। আর বেঙ্গল স্পেকটেটর, বিদ্যাদর্শন-তত্ত্ববোধিনীর মধ্য দিয়ে সেই সন্ধান গদ্যের স্বরূপ-সন্ধানের সঙ্গে মিলে গেছে।

কিন্তু অমিলের মূল অনেক গভীরে ছিল। তাই ১৮৬০ পর্যন্ত, পত্রপত্রিকায় গদ্যের অন্যান্য উপকরণ-বিন্যাস যখন সুশৃঙ্খল, বাংলা গদ্য যখন উপন্যাসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তখন বাংলা যতিবিন্যাসে শৃঙ্খলা আসে নি, তখনো যতিবিন্যাস গদ্যরীতির ওতপ্রোত হয়ে ওঠে নি। প্রথমদিকে যেমন ছিল দাঁড়ির বাহুল্য, এই শেষ পর্বে তেমনি দেখা দিল কমার বাহুল্য। গদ্যের প্রবহমানতার টানে দাঁড়ি যেন বাধা হয়ে ওঠে, কমার স্বল্পবিরতি যেন গদ্যকে নিয়ত-প্রবাহিত রাখে।

কিন্তু গদ্যের আদর্শ যখন স্থির হয়ে গেছে, — সুতরাং সেই সঙ্গে যতিবিন্যাসের রীতিও, — তখন এই কমা বাহুল্য বা গদ্যের গড়নের সঙ্গতিহীন যতিব্যবহার গদ্যের গড়ন আর যতিবিন্যাসের ভেতরের কোনো অন্তর্গত বিরোধের প্রমাণ নয় বরং যতিবিন্যাস গদ্যের যে-বহু-বিস্তারী লক্ষ ও চেষ্টারই ওতপ্রোত অংশ, তাকে আয়ত্ত করার সাধনারই প্রমাণ। এই পর্বের কয়েকটি উদাহরণে দেখা যাবে চিহ্নের অপ্রতুলতা বা কমার বাহুল্য গদ্যকে প্রভাবিত করতে পারছে না বরং গদ্যের টানেই যতির নতুন বিন্যাস স্থির হয়ে যাচ্ছে।

উ ৩০. 4 জুন, ১৮৫৫, সংবাদ প্রভাকর।

জানবাজার নিবাসিনী পুণ্যশীলা শ্রীমতী রাণী রাসমণি জ্যৈষ্ঠ পৌর্ণমাসী তিথিযোগে দক্ষিণেশ্বরের বিচিত্র নবরত্ন ও মন্দিরাদিতে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ঐদিবস প্রায় তথায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল, এই পুণ্যকর্ম্ম উপলক্ষে রাণী রাসমণি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন, প্রত্যেক শিবস্থানে রজতময় যোড়শ ও অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য পট্টবস্ত্র নগদ টাকা দিয়াছেন; তারামূর্ত্তি স্থাপনোপলক্ষে যে যে অনুষ্ঠানের আবশ্যক তত্তাবৎ বাহুল্যরূপ আয়োজন হইয়াছিল, আহারাদির কথা কি বলিব, কলিকাতার বাজার দূরে থাকুক, পাণিহাটি, বৈদ্যবাটি, ত্রিবেণী ইত্যাদি স্থানের বাজারেও সন্দেশাদি মিষ্টান্নের বাজার আগুন হইয়া উঠে, এমত জনরব যে ৫৫০ মোন সন্দেশ হয়, নবরত্নের সম্মুখস্থ নাটমন্দির অতি রমনীয় রূপে সজ্জীভূত হইয়াছিল, ঝাড়লণ্ঠন প্রভৃতিতে গঠিত হয়, বরাহনগর অবধি নাটমন্দির পর্য্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে বাল্খাই রোসনাই হয়, কোনরূপ অনুষ্ঠানের কোনরূপ বৈলক্ষণ হয় নাই, পুণ্যবতীর পুণ্যকার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে, গঙ্গার উপর পিনিস, বজরা, বোট, ভাউলিয়া প্রভৃতি জলযান কত গিয়াছিল, রাজপথে গাড়ীই বা কত একত্রিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না, কাঙ্গালি লোক অনেক গিয়াছিল, তাহারা মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপাদেয় দ্রব্যাদি আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া কেহ টাকা কেহ অর্দ্ধ মুদ্রা কেহ কেহ বা সিকি দক্ষিণা লইয়া বিদায় হইয়াছে, গোস্বামী মহাশয়েরা প্রায় সকলেই গিয়াছিলেন, রাণী তাঁহাদিগের সকলের যথাযোগ্য সম্মানপুরঃসর টাকা দিয়াছেন, এই পুণ্যকার্য্যে রাণী রাসমণির প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইবেক, অনেক পুণ্যাত্মা ব্যক্তি অনেকানেক স্থানে দেবালয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু

এপ্রকার বৃহৎ নবরত্ন ও নাটমন্দির কেহই করেন নাই, জগদীশ্বর পুণ্যবতী রাণী রাসমণিকে যে প্রকার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিয়াছেন, সেই প্রকার বৃহৎ অন্তঃকরণও দিয়াছেন, তিনি স্বীয় অতুল ধনের সার্থকতা করিলেন, এই অবনীমণ্ডলে তাঁহার চিরকীর্ত্তি সংস্থাপিত রহিল । [সা. বা. স. ৪. ঘোষ পৃ ৭৫৫] ।

উ ৩১. ১২ জুন, ১৮৫৫ সংবাদ প্রভাকর ।

অধুনা ভলুয়া প্রদেশে প্রভাকর পত্রিকায় বর্ণিত বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গ পরম্পর জন্মশ্রুতি হওনে এ প্রদেশস্থ আপামর সাধারণ সকলেরি এমত মনোরঞ্জ নোৎসাহের সহিত লোলুপ যে হাটে ঘাটে গোষ্ঠে মাঠে গমনে ভ্রমণে গৃহে প্রাঙ্গণে উত্থানোপবেশনে ভোজনে শয়নে বোধকরি সুপ্তিসম্ভোগীয় স্বপনেও ঐ কথার আন্দোলন হইতেছে । [সা. বা. স. ঘোষ, পৃ ৭৭৬]

উ ৩২. ২৩ জুলাই, ১৮৫৫, সংবাদ প্রভাকর

মুরশিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট মেং টুগুড সাহেব লেপ্টেনান্ট গবরণর সাহেবের নিকট যে পত্র লেখেন তাহা ইংলিসম্যান প্রভৃতি পত্রে প্রকাশ হইয়াছে যদিও ঐ সংবাদ আমরা অরঙ্গাবাদের সংবাদদাতার পত্রদ্বারা প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি, তথাচ মেং টুগুড সাহেবের পত্রের মর্ম্ম কিঞ্চিৎ গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করিলাম । " তিনি ১৪ জুলাই তারিখে সৈন্য লইয়া পলসায় উপস্থিত হয়েন, সেখানে রাজবিরোধীদিগকে দেখিতে পান নাই, তাঁহার গমন করিবার পূর্ব্বেই সাঁওতালেরা ঐ গ্রাম লুঠ করিয়া মহেশপুরাভিমুখে যাত্রা করে, সেনারা ধান্যক্ষেত্র দিয়া গমন ও নদী নালা পার হইতে বিস্তর ক্লেশ পায় কিন্তু পলসাতে তাহারা বিশ্রাম করে নাই, একেবারে মহেশপুরে গিয়া ১৫ তারিখে প্রাতঃকালে এক সরোবরের নিকটে প্রায়৪।৫০০ সাঁওতালকে আক্রমণ করে, ঐ দলের অধ্যক্ষ সিদু ও কিনু তাহারদিগের আদেশক্রমে সাঁওতালেরা তীর ছুড়িয়াছিল তাহাতে কেবল ৫ জন সেপাই অল্পঘাতি হইয়াছে । বিপক্ষদিগের একাত হত ও একাত নিহত হওয়াতে তাহারা অতি বেগে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । সেনারা তাহারদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইতে পারে নাই, মহেশপুরে বিখ্যাত জানকীকুমারীর স্বামী গোপাল সিংহের বাটী ঐ অতি উচ্চ প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত, দুরাত্মারা তাহা আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই ।

...জগডিহি নামক স্থানে সাঁওতালদিগের ঠাকুর বাটী, টুগুড সাহেবসৈন্য লইয়া সেই স্থানে যাইবেন, যেহেতু ঐ ঠাকুরের প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে যুদ্ধ সময়ে ইংরাজদিগের বন্দুক হইতে কেবল জন কিতি হইবেক, ইহাতেই মূর্খ লোকেরা রাজবিরুদ্ধ অস্ত্রধারণ করিয়াছে এইক্ষণে কিছু দিবস অরঙ্গাবাদ অথবা পলসা কিম্বা মহেশপুরে সৈন্য রাখিতে

হইবেক, শীত ঋতুর আগমন না হইলে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করা যাইবে না, কিন্তু যাহাতে উপস্থিত অত্যাচার নিবারণ হয়, এবং দুষ্টেরা প্রজাদিগের প্রতি কোনপ্রকার অত্যাচার করিতে না পারে এমন উপায় করিতে হইবেক। [সা. বা. স. ৪ ঘোষ পৃ ৭১০]

উ ৩৩. ২৫ নভেম্বর, ১৮৫৬, সম্বাদ ভাস্কর

মহাশয়, নিষ্ঠুরতার বিষয় কি কহিব, আপনি যদি স্বচক্ষে দেখিতেন তবে অশ্রুজলে অবগাহন করিতেন, পোলিস সম্পর্কীয় লোকেরা দামিনীকো নামক স্থান হইতে ৫০ জন সন্তালকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে তাহারদিগের অবস্থা দেখিলে পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিরাও রোদন করেন, ঐ সকল সন্তালেরা যে দিবস ধৃত হয় সে দিন ও তৎপর দিবা রাত্রি নিরাহারে বন্ধনাবস্থায় ছিল আহারার্থে জলবিন্দুও পায় নাই; পোলিসের লোকেরা তাহারদিগের যেমন ধৃত করিয়াছে অমনি পায়ে বেড়ী দিয়াছে, হাতে কড়ী পায়ে বেড়ী, ঐ কড়ী বেড়ী শৃঙ্খলায় যুক্ত করিয়াছে — তৎপরে পঞ্চ পাঁচজনকে এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া টানিয়া লইয়া আসিয়াছে, বেড়ীর ঘর্ষণে অনেকের হস্তপদে ঘা হইয়া গিয়াছে, সেই ঘা হইতে ঝর্ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে, পথে চলিতে না পারিয়া অনেকে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহারদিগকে টানিয়া লইয়া আসিয়াছে, তাহাতে সর্বাঙ্গের চর্ম্ম ছড়িয়া গিয়াছে ঐরূপ টানাটানিতে এক বৃদ্ধ মরিয়া গিয়াছিল, তাহার মৃতদেহ হস্তিপৃষ্ঠে তুলিয়া বীরভূমে পাঠাইয়া দিয়াছে; দামিনীকো হইতে বীরভূমে আসিতে আবদ্ধ সন্তালেরা যে কয়েকদিবস পথিমধ্যে ছিল তাহারা অন্ন পায় নাই, বীরভূমের কারাগারের সম্মুখে আনিয়া যখন শৃঙ্খল খুলিয়া দিল তখনও তাহারা হাঁটিয়া কারাগারে প্রবেশ করিতে পারিল না, বেত্রাঘাত করিতে করিতে পদাতিকেরা হেছড়ীয়া টানিয়া জেহেলখানায় লইয়া গেল পরে তাহারদিগের কপালে কি হইয়াছে আমি জানিতে পারি নাই। [সা. বা. স. ৪ ঘোষ পৃ ৩৩১]

উ ৩৪. ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৭, সম্বাদ ভাস্কর

গত শুক্রবারাপরাহ্নে গবর্ণমেন্ট বাটীতে মহাসভা হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতা নিবাসি প্রবাসি সম্ভ্রমরাশি মহাশয়েরা অনেকে গমন করিয়াছিলেন, গবর্ণমেন্টের বাটীর চতুর্দিকে গাড়ি, ঘোড়া, পাল্কী, লোক ইত্যাদির বহু সমারোহ দৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু এইক্ষণে ইংরাজেরা বড় প্রজা পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছেন কিছুকাল গত হইল গবর্ণমেন্টের পোলিস পথিকদিগের প্রস্রাব ধরিয়া বেড়াইতেন তাহাতে মান্যগণ রাজপথে প্রস্রাব করিতেও যান নাই, আবার গবর্ণমেন্ট সভায় নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত লোকদিগের পাদুকা ধরাধরি আরম্ভ করিয়াছেন, পাছে সভা প্রবেশকালীন সেক্রেটারী সাহেবেরা

বহির্দ্বারে পাদুকা রাখিয়া যাইতে বলিলেন এই ভয়ে বহু ব্যক্তি গমন করেন নাই, পূর্ব্বে নিয়ম ছিল মান্য লোকেরা কোন সভায় গেলে কর্ত্তাপক্ষ অগ্রে হাস্যবদনে তাঁহারদিগের আস্য দর্শন করিতেন, এইক্ষণে মলিন বদনে অগ্রে পাদদ্বয় দৃষ্টিক্ষেপ করেন ইহার অভিপ্রায় এই যে পাদুকা সহিত যদি কেহ যান তবে পাদুকা পরিত্যাগ করিতে বলিবেন, নিমন্ত্রিতগণ রাজসভায় সুখে প্রবেশ করিবেন আমোদ করিয়া প্রত্যাগত হইবেন ইহার মধ্যে পাদুকা টানাটানী কেন আরম্ভ হইল ? যদি কহেন এতদ্দেশীয় লোকেরা দেবাগার প্রবেশকালীন পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া যান, রাজসভায় গবর্ণরাদির শ্বেতমূর্ত্তি দর্শনে নৃপাগারে কেন তাহা করিবেন না ? ইহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরা বলিতে পারেন দেবাগারের অন্নব্যঞ্জন, তন্ডুল কদলাদি ভোগবস্তু সকল উপস্থিত থাকে, চর্ম্মপাদুকা সন্নিধানে তাহা অপবিত্র হয়, রাজসভায় তন্ডুল কদলাদি ব্যবহার নাই, শ্বেতমূর্ত্তিরা যখন দেবতাদিগের ন্যায় আতপতন্ডুল সহিত রম্ভা চর্ব্বন করিবেন তখন প্রজারাও চর্ম্মপাদুকা সহিত গমন করিবেন না, অগ্রে দেবদেহ ধারণ পূর্ব্বক দৈবাচার ব্যবহার করুন তৎপরে নিমন্ত্রিতেরাও পাদুকা পরিত্যাগপূর্ব্বক সভা প্রবেশ করিবেন অমর না হইতেই সম্ভ্রমজন্য মান্য লোকদিগের পাদচর্ম্ম ধরিয়া টানাটানী করিতে আসিলেন ইহাতে লার্ড কেনিং মহাশয় সেক্রেটরী বাহাদুরদিগকে সাবধান করিবেন তাঁহারা যেন আর প্রজাদিগের জুতা লইয়া বিবাদ করেন না ।- [সা. বা. স. ঘোষ, পৃ ৩৮৪]

১। বাক্যগঠনের উপাদানবিন্যাস সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয়ে এসেছে । অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার বাক্যাংশ (clause) নির্মাণেও সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহারের নেহাত বাঙালি বৈশিষ্ট্যও, সম্ভবত অচেতন সমর্থন পাচ্ছে ।

২। কমা, সেমিকোলন, উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার প্রায় নির্দোষ ।

৩। কিন্তু দাঁড়ি ব্যবহারে অনভ্যস্ততা এত যে ২নং উদাহরণ ব্যতীত সর্বত্রই কমা দিয়ে দাঁড়ির কাজ সারার চেষ্টা হচ্ছে । দাঁড়ি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাত্র প্যারার বা রচনার শেষে ব্যবহৃত হয়েছে । ৫নং উদাহরণে যতিব্যবহারে ও বাক্যগঠনে কণ্ঠস্বরের অনুসরণও কোথাও কোথাও ঘটেছে ।এতৎসত্ত্বেও দাঁড়িচিহ্ন ব্যবহারে এই কুণ্ঠার বা অনভ্যস্ততার কারণ গদ্যের সঙ্গে লেখকের স্টাইলের অন্বয় সাধনের চেষ্টাই — সে চেষ্টা সর্বদা ফলপ্রসূ না হলেও —— সংবাদ-সাময়িকপত্রের শুরু থেকেই আছে —— যখন দাঁড়িই ছিল একমাত্র যতিচিহ্ন । দাঁড়িকে বাদ দিয়ে বাক্যগঠনের নানা চেষ্টাই নানা সময়ে হয়েছে । কিন্তু বাংলা গদ্যের রূপ যখন স্থির হয়ে গেছে তখন বাংলা গদ্য তার নিজস্ব নিয়মেই সেই যতিবিন্যাসকে গ্রাহ্য করেও অগ্রাহ্য দেয় । ১৮৫৮ -র পর থেকে সেই ইতিহাস শুরু হন ।

এই পাঁচটি উদাহরণ বিষয়-বিচারে বাছা হয়েছে। তার কারণ এই সময় যতিচিহ্নের ব্যবহার স্বতন্ত্র বিচারের অবকাশ রাখে না, যে- বিষয় নিয়ে লেখক লিখছেন সেই বিষয় সম্পর্কে তাঁর আবেগসঙ্গতি ও যুক্তিশৃঙ্খলার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে যেমন বাক্যগুলি তৈরি হচ্ছে, তেমনি যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩০ ও ৩২ সংখ্যক উদাহরণে সাংবাদিক গদ্যের তথ্যনির্ভর নিরপেক্ষতা প্রধান হয়ে উঠতে চায় যেমন, ৩১ সংখ্যক উদাহরণে তেমনি ব্যক্তিস্টাইলের একটি প্রায় চূড়ান্ত নিদর্শন মেলে। ৩৪ সংখ্যক উদাহরণের শ্লেষের বিশিষ্ট ভঙ্গিটি বাংলা সাংবাদিকতায় অন্যতম প্রধান ভঙ্গি। ৩৩ সংখ্যক উদাহরণটিতে সাঁওতালবিদ্রোহ দমনের সরকারি ব্যবস্থায় ক্লিষ্ট একজন নাগরিকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে —— এইটি যেমন একজন ব্যক্তির গদ্যরচনার উদাহরণ, তেমনি আবার ৩২ সংখ্যক উদাহরণের সঙ্গে তুলনীয়।

৩০ ও ৩২ সংখ্যক উদাহরণে প্রসঙ্গ ভাগ খুব স্পষ্ট যদিও যতিচিহ্নদ্বারা সর্বদা চিহ্নিত নয়। ৩০ সংখ্যক উদাহরণে প্রথমে রাণী রাসমণির কীর্তিটির বিবরণ, তারপর খাওয়া-দাওয়ার বিবরণ, তারপর রাস্তায় ও গঙ্গায় ভিড়ের বিবরণ, তারপর দানের বিবরণ। বিষয়ের এই প্রসঙ্গভাগ কোনো জায়গাতেই চিহ্নিত না হওয়া সত্ত্বেও স্পষ্ট। কিন্তু টুগুড সাহেবের সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনের বিবরণের মতো সুবিন্যস্ত নয়। এই বিবরণ (উ ৩২) দুটি প্যারায় ভাগ করা, উদ্ধৃতিচিহ্ন - দাঁড়ি - কমা যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এমন - কি ভূমিকার বাক্যটি, যদিও, তথাচ, ব্যবহার সত্ত্বেও স্পষ্ট ও সরল। উদ্ধৃতিভুক্ত অংশের প্রথম দাঁড়িটি পড়েছে সৈন্যদের সঙ্গে সাঁওতালদের সংঘর্ষের বিবরণের পর। অথচ দাঁড়ির আগে কমায় কমায় ঘটনাপরম্পরার এমন বর্ণনা —— যার সঙ্গে লেখকের যোগ খুব প্রত্যক্ষ নয়। সাঁওতালদের সম্পর্কে 'দুরাত্মা' 'মূর্খ' ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার সত্ত্বেও এই রচনাটিতে লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপন রচনারীতির প্রধান অবলম্বন নয়। প্রধান অবলম্বন ৩০ সংখ্যক উদাহরণেও ছিল না কিন্তু সেখানে বিবরণটি তো লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে। সেই প্রত্যক্ষনের উত্তেজনা লেখককে কোনো স্বস্তি দেয় নি। তাই যতিবিন্যাস সুশৃঙ্খল নয়। অথচ তার চাইতে অনেক গুরুতর বিষয় (৩২) লেখককে সেই স্বস্তি দিয়েছে — স্বস্তি দিয়েছে বলেই যতি অপেক্ষাকৃত সুবিন্যস্ত।

অথচ এই বিষয়টি নিয়ে যখন একজন ব্যক্তি চিঠি লেখেন, (উ ৩৩) তখন প্রত্যক্ষনের উত্তেজনায় তিনি সারাটি চিঠিতে একবারও নিশ্বাস ফেলতে পারেন না, বাক্যগুলি ঠিকভাবেই গঠিত, কিন্তু কোথাও দম ফেলার অবকাশ নেই। এর আগে নানা সময়ের নানা উদাহরণে দেখা গেছে যে প্রত্যক্ষনের উত্তেজনায় বাক্যবন্ধেরও বিশৃঙ্খলা ঘটছে না বটে কিন্তু যতিবিন্যাসের ভেতর সেই উত্তেজনার প্রকাশ ঘটে যাচ্ছে।

৩১ সংখ্যক উদাহরণটির প্রথমাংশটুকু মাত্র উদ্ধৃত হয়েছে । রচনার বাকি অংশে মুখের কথার ভঙ্গি আরো বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করা হয়েছে । বিষয়ের তাগিদে যখনই মানুষের মুখের কথার ভঙ্গিকে ধর্ম হিসেবে আশ্রয় করতে হয় তখনই সেখানে মুখের কথার যতিপাতও ঘটে । এই রচনায় লেখক বাক্যকে প্রয়োজনীয় যতিচিহ্নে চিহ্নিত করতে পারছেন না, কিন্তু তাঁর বাক্যগুলি সেই যতিচিহ্নের বিরতিচিহ্নিত হয়েই ব্যবহৃত হচ্ছে ।

মুখের কথার এই ভঙ্গিকে বাংলার সংবাদসাময়িকপত্রের গদ্যে প্রথম থেকেই শ্লেষযোগ্য বিষয় সম্পর্কে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে । ৩১ সংখ্যক উদাহরণে তার প্রমাণ আছে । কিন্তু সাংবাদিক নিরপেক্ষতার ভঙ্গির সঙ্গে এই শ্লেষের ভঙ্গি মিশে গিয়েছে ৩৪ সংখ্যক উদাহরণে । এই ভঙ্গিতে উত্তেজনার পরিবর্তে শান্তি ও বিশৃঙ্খলার পরিবর্তে যুক্তিপরম্পরার শৃঙ্খলা অনেক বেশি কার্যকর । প্রত্যক্ষনের উত্তেজনায় যে আবেগ আসে এই রীতিতে তা অনুপস্থিত । তাই এখানে লেখকের ভঙ্গি অনেক বেশি প্রস্তুত । কমা-র পর কমায় 'গভর্নমেন্ট বাটীতে মহাসভা'-র বিবরণ দিতে দিতে লেখক পুলিশের 'প্রস্রাব ধরিয়া বেড়ান' ও 'পাদুকা ধরাধরি'-র প্রসঙ্গ বলে গেছেন, মাঝখানে একটি 'কিন্তু'-তে এই দুই অংশকে সচেতন পৃথক করে । এরপরে, রচনাটির মাঝ বরাবর পরপর দুটি প্রশ্নচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে । প্রথম প্রশ্নচিহ্নেই রচনার প্রধান প্রসঙ্গ শেষ হয়েছে । কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নচিহ্নে লেখক তাঁর শ্লেষের বিষয়টিকে নতুনভাবে সম্প্রসারণের ও ব্যবহারের সুযোগ পান । মূল বক্তব্যকে ব্যাহত না করেও অলঙ্কারের এই স্বাধীন সম্প্রসারণে রচনাটির শৈলীতাৎপর্য অনেক বেড়ে যায় । এখনো দাঁড়িচিহ্ন ব্যবহারে অনির্দিষ্টতা থাকলেও এখানে রচনার স্টাইল ও যতিবিন্যাস এমন ওতপ্রোত হয়ে উঠছে ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য এমন শৈলীবৈশিষ্ট্যে পৌছে যাচ্ছে, যেখানে যতি আর আলাদা উপকরণ হিসেবে থাকছে না, গদ্যচর্চার অভ্যাসেরই অংশ হয়ে পড়ছে ।

১৮৬০ সাল নাগাদ যতির সঙ্গে গদ্যের অন্যান্য সম্পর্ক স্থাপনের নানা প্রচেষ্টার শেষে গদ্যচর্চার সেই অভ্যাস শুরু হল — যতিবিন্যাসের জন্য যখন আর পৃথক মনোযোগের প্রয়োজন থাকে না ।

পরিশিষ্ট

সাংবাদিকতার ইংরেজি ও বাংলা রীতির পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার জন্য একই বিষয় নিয়ে এই দুই ভাষার রচনার তুলনা করা যায়; বিশেষত ইংরেজি-বাংলা-দ্বিভাষিক না হওয়া সত্ত্বেও অনেক পত্রিকাতে বিশেষ বিশেষ রচনা এই দুই ভাষাতেই ছাপা হত দুই পাশাপাশি কলমে অথবা পরপর। পার্লামেন্টের বিতর্ক, সরকারি আইন ও বিজ্ঞপ্তি, ইত্যাদি নিশ্চয়ই মূলত ইংরেজি ভাষাতেই লেখা, বাংলায় অনুবাদ হত। যতিচিহ্ন-ব্যবহারের পার্থক্যের উদাহরণ হিশেবে এখানে এ-রকম মাত্র তিনটি রচনা অংশত উদ্ধৃত হচ্ছে। ইংরেজি রচনার সঙ্গে ভাষা ও ভঙ্গির মিলের চেষ্টা থাকলেও, যতিচিহ্ন-ব্যবহারে বাংলা রচনা যেন অনড় — এমন কি কোথাও কোথাও অনুবাদে যথেষ্ট কৃতিত্ব সত্ত্বেও অনুবাদক-লেখক যতিচিহ্নে প্রায় যেন অপরিবর্তনীয়। ইংরেজি রচনারীতির নৈকট্য অথচ যতিচিহ্ন-ব্যবহারের বেলায় রক্ষণশীলতা গদ্যরীতিতে কী ধরণের বৈপরীত্য সৃষ্টি করতে পারত, তারও সাক্ষ্য মেলে এই উদাহরণগুলিতে।

শ্রীযুত ম্যাকিন্টস কোম্পানির ব্যাপার।

ম্যাকিন্টস কোম্পানির কুঠীবিষয়ক ব্যাপার সম্পাদনার্থ ইনশালমেন্ট আদালত কর্তৃক যে আসৈনি সাহেবেরা নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং কুঠীর মহাজনেরদের কর্তৃক যে এষ্টি নিযুক্ত হইয় ছিলেন তাঁহারদের পরস্পর মোকদ্দমায় শ্রীযুত কৌন্সেলি সাহেবেরদের সওয়াল জওয়াব শুনিতে এবং তদ্বিষয়ক নিষ্পত্ত্যর্থই সুপ্রিম কোর্টে গত সোমবারের সময় গত হয়। শ্রীযুত সর জন ফ্রাঙ্কস সাহেব ও শ্রীযুত সর এড্বার্ড রৈয়ন সাহেব বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহারদের এই অভিপ্রায় যে ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হয় এবং উভয় বিবাদীই উকীল খরচা দেন শ্রীযুত সর এড্বার্ড রৈয়ন সাহেব আরো কহিলেন ...

১৩ জুলাই ১৮৩৩ সমাচার দর্পণ

Affairs of Mackintosh and Co.

The Supreme Court was occupied the whole of Monday in having the arguments of Counsel, and in giving Judgement in the case between the Assignees appoint by the Insolvent Court, andthe Trustees appointed by creditors to the Estate of Mackintosh & Co. Mr. Justice Franks and Mr. Justice Ryan were on the Bench, and the decision come to by them was, that a verdict be given for plaintiffs, and each party pay their own costs. Mr. Justice Ryan, in additi ovserved, that, ...

সমাচার দর্পণ শনিবার ১৭ জানুয়ারি ১৮৩৫

শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখী হওয়া গেল যে শ্রীল শ্রীযুত লার্ড উইলিয়ম বেন্টীঙ্ক ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে গমনের যে সময় স্থির করিয়াছিলেন তদপেক্ষা শীঘ্রই গমন করিতে হইবে। বিশেষত: করসোয়া জাহাজ সমুদ্রপথ হইতে প্রত্যাগত হইবামাত্রই গমন করিবেন।

শ্রীল শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এতদ্দেশ হইতে গমন করাতে সর্বসাধারণ লোকেরই অত্যন্ত খেদ জন্মিবে কিন্তু এতদতিরিক্তও শ্রীল শ্রীযুতের গমনের কল্পিত সময়ের পূর্বেই যে নিমিত্ত অর্থাৎ অস্বাস্থ্য প্রযুক্ত এতদ্দেশ হইতে গমন করিতে হইল সেই অপর এক মহা খেদের বিষয়।

অপর শ্রীল শ্রীযুতের পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষের গবর্নর জেনরলী পদে কোন্ মহাশয় নিযুক্ত হইবেন এ বিষয়ে অদ্যাপি আমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন আছি। কলিকাতাস্থ একজন ইঙ্গলন্ডীয় সম্বাদপত্রসম্পাদক লিখিয়াছেন যে শ্রীযুত সার ফ্রেড্রিক আদম সাহেবের এই উচ্চপদাভিষিক্ত হওনের সম্ভাবনা আছে কিন্তু এতদ্রূপ অনুভব করণের এতাবন্মাত্র হেতু দৃষ্ট হইতেছে যে শ্রীযুত সার ফ্রেড্রিক আদম সাহেব যে মান্দ্রাজ রাজধানী হইতে এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন ইহার অন্য কোন উপযুক্ত কারণ বোধগম্য হয় না।

SATURDAY, 17th JANUARY, 1835

We are sorry to learn that Lord William Bentinck, on consideration of health, will probably be obliged to quit India rather earlier than was expected, immediately on the arrival of the Curacoa from sea. In addition to the regret which all classes of the community will feel at the departure of our Governor General, an additional source of regret is the cause which obliged his Lordship to leave India at a more early period than he had expected.

We are still in the dark respecting the individual who is to succeed his Lordship in the Government of India. One of our English contemporaries suggests the probability of Sir Frederick Adam's being appointed to this elevated post; but for this suggestion there appears no other ground than this, that no one is able to suggest any other reason for Sir Frederick's late visit to the Presidency.

সমাচার দর্পণ, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫

চিনির মাসুল

শ্রীযুত পিলবর সাহেব কহিলেন যে ভারতবর্ষজাত চিনির বিষয়ে আমি কিছু কহিতে ইচ্ছুক আছি। ভারতবর্ষের কৃষিকর্ম্ম ও রাজস্ব ও বাণিজ্যের অতত্যধমাবস্থা দেখিয়া এই বিষয়ের প্রতি আমার মনঃসংযোগ হইতেছে বিশেষত: কোম্পানি বাহাদুরের যে টাকা দেনা হইয়াছে তন্নিমিত্ত এই বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে ৬কোটি টাকার ন্যূন নহে আনয়ন করিতে হইবে। এবং ইঙ্গলন্ড দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের ভার দেখিয়া বোধহয় যে ভারতবর্ষীয় প্রজারদের শিল্প-দ্রব্যের প্রায় কিছু পৌষ্টিকতা করা যাইতে পারিবে না কিন্তু অবশ্য আমার এমত ভরসা আছে যে ইঙ্গলন্ডীয় শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য যদ্যপি ভারতবর্ষে প্রেরণ করা যায় এবং যদি ভারতবর্ষ হইতে এমত ভূরি২ টাকা ইঙ্গলন্ড দেশে আনিতে হয় তবে ইঙ্গলন্ড দেশের অন্যান্য কলোনিজাত দ্রব্যের উপর যে কম মাসুল নির্দ্দিষ্ট আছে তত্তুল্য মাসুল ভারতবর্ষের ভূমিজাত দ্রব্যের উপরেও অবশ্য রাখিতে হয়। বিশেষত: ইক্ষুর কৃষি বিষয়ে কহি কৃষি সম্পর্কীয় দ্রব্যের মধ্যে ইক্ষু অতিপ্রিয় এবং একপ্রকার তাহা হিন্দুধর্ম্মকর্ম্মসম্পর্কীয়ও বটে। আমি অবশ্য স্বীকার করি যে প্রতি বৎসরেই যদি ভারতবর্ষ হইতে বহুসংখ্যক টাকা আকর্ষণ করিতে হয় তবে ভারতবর্ষীয় লোকেরদের কৃষিসম্পর্কীয় দ্রব্য বিশেষত: চিনির বিষয়ে কিছু উপকার না করিলে নিতান্ত ভয় জন্মে। ভারতবর্ষের দ্বারা এতদ্দেশের অত্যন্ত উপকার হইতেছে অতএব ভারতবর্ষেরও তত্তুল্য উপকার করা অতিযথার্থ হয় এমত সকলের অপেক্ষাও আছে কিন্তু ভারতবর্ষের তত্তুল্য উপকার যে হইতেছে কেহই কহিতে পারে না। যদ্যপি ভারতবর্ষ ও আমেরিকা উপদ্বীপজাত চিনি ও রমপারাপের মাসুল সমান করা যায় তবেই ভারতবর্ষের উপকার হইতে পারে। এমত সুনিয়ম করাতে ইঙ্গলন্ড দেশ ও ভারতবর্ষের বাণিজ্যে কি পর্য্যন্ত যে উপকার তাহা আমার কথনাবশ্যক নাই কিন্তু আমার ভরসা আছে যে শ্রীযুত সভাপতি মহাশয় আমারদিগকে জ্ঞাপন করিতে পারিবেন যে শ্রীল বাদশাহের মন্ত্রির সঙ্গে এই বিষয়ের কোন সুনিয়ম করণের সম্ভাবনা আছে।

তাহাতে শ্রীযুত সভাপতি মহাশয় উত্তর করিলেন যে চিনির উপরে সমান মাসুল নির্দ্দিষ্ট হয় এই বিষয়ের এক দরখাস্ত গত মিছিলে বোর্ড কন্ত্রোলের শ্রীযুত প্রেসিডেন্ট সাহেব হৌস অফ কমন্সে প্রস্তাব করিয়াছিলেন। আমি বোধ করি যে ঐ মহাশয় আগামি মিছিলে এই পুনর্ব্বার উত্থাপন করিবেন এবং ভরসা করি যে তাহাতে বিলক্ষণ কৃতকার্য্যও হইতে পারিবেন। উত্তরকালে এই বিষয়ের আন্দোলন হইলে ইহাই এক উপকারস্বরূপ হইবে যে আমেরিকা উপদ্বীপসহ ব্যবসায়ি লোকেরা যে আপত্তি করিতেন সে আপত্তি এইক্ষণে আর নাই পূর্ব্বে তাঁহারা এই আপত্তি করিতেন যে (...) আমেরিকা উপদ্বীপজাত চিনির উপরে কম মাসুল থাকিবে এই অঙ্গীকারে ঐ দেশীয় ভূমি বন্ধক দেওয়া গিয়াছে অতএব সেই ভূমির তদ্রূপ বন্ধন খালাস না হইতে যদি অন্য দেশ জাত চিনি কম মাসুলে ইঙ্গলন্ড দেশে আমদানী হয় তবে অযথার্থ হয় এই আপত্তি খন্ডন হইয়াছে। .....

"Mr. Fielder was extremely anxious to make a few remarks on the subject of the sugars in India; and he was led to it by looking to the present distressed state of India with respect to her agriculture, trade, and finances, more particularly on his finding, by the accounts of the expenditure of the company, that a sum exceeding six million starling was required to be remitted from India, to answer payments in London for the current year. — (Hear !) And viewing the state of an manufactures, he could hardly expect much, or indeed the least encouragement, could be given to the manufactues of India. But he certainly did expect that, if we did send English manufactures into India, and at the sametime require from her a remittance of more than six millions sterling in one year, that the natives of India should have the some rights and privileges, with respect to agricultural produce and trade, enjoyed by other British colonies. He particularly alluded to the culture of the sugar cane, the most favourite and beneficial employment of the Hindoo, indeed one of his religious duties. He must confess, that he should feel greatly alarmed at the very large remittances required year after year from India, unless greater encouragement was given to the agricultural purmits of the natives of India, and particularly in the produce of the came. -(Hear !) Looking at the vast advantage flaming in to this country, no one could say, that India was deriving anything corresponding to the benefits She bestowed, in respect to the exrension of her trade and the disposal of her produce, which she naturally expected, and in strict Justice ought to derive. That extension might be made, If the duties on East and West Indian sugars and rums were equalized. If would be unnecessary for him to enumerate the many advantages which must accure, as well to the commerce of England or to that of India, from the enactment of such a measure. He (Mr. F.) therefore hoped to hear from the Honourable Chairman that some progress was making with Ministers to words so desirable a receit.--(Hear, hear !)

"The chairman. —— The Honourable Proprietor will recollect, that a petition from this court was presented to the House of Commons in the last Session by the President of the Board of Control; praying for an equalization of the duties on sugar. The subject sill, I hope, be brought forward early in the next Session by

the same right Honourable Gentleman; and I trust, with increased probability of success. We shall have this advantage in any future discussion of the question, that the grounds of objection, which have hitherto been made by the West - Indian trade, will then have been removed. It has hitherto been objected, that large advances had been made upon West Indian property; upon the faith of this protecting duty, and that it would be unjust to equalize the duties while those advances remained unliquidated. That objection will now be removed.

নি.চ.